পুরাতন প্রসঙ্গ।

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ,
প্রণীত।

কলিকাতা।

১৩২০

মূল্য পাঁচ সিকা

PRINTED BY

GOPAL CHANDRA ROY AT THE

PARAGON PRESS,

203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

নিবেদন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় "পুরাতন প্রসঙ্গ" রচিত হয়। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সুহৃদ্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নাম রাখিলেন "পুরাতন প্রসঙ্গ"; এবং যে "আর্য্যাবর্ত্ত" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই "আর্য্যাবর্ত্তে" এগুলির ক্রমিক প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রন্থের সূচনাটি "মানসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও নূতন কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। "মহাভারত রচনা-সভা" "ভারতবর্ষ" পত্রিকার ব্লক হইতে গৃহীত; অন্য ব্লক গুলি "আর্য্যাবর্ত্তে"র।

পত্রিকায় প্রকাশকালে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ও "উপাসনা" পত্রিকার সমা-

লোচকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পুস্তকের প্রুফ যথাসাধ্য দেখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু আমার দোষে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। ত্রুটি স্বীকার করিলেই যে পাঠক পাঠিকা লেখককে ক্ষমা করিবেন এমন কোনও কথা নাই; আমি কিন্তু নাকে খৎ দিয়া এবারকার মত বিদায় লইলাম।

৬০, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট
কলিকাতা
৬ই শ্রাবণ, [illegible]

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

নামের বর্ণানুক্রমিক সূচিপত্র

উ

এ

ক

চ

জ

ট

ধ

ন

প

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

পুরাতন প্রসঙ্গ।

সূচনা।

প্রথম যৌবনে সুখের কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে যে মায়াজাল রচনা করে, উত্তরকালে তাহা স্মরণ করিয়া হয় ত সকলেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন; তাই হয় ত ইংরাজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন লিখিয়াছেন, Imagination is perhaps holier than memory, কল্পনা বোধ হয় স্মৃতি অপেক্ষা পবিত্রতর। কল্পনা নবীন নবীনার, স্মৃতি প্রবীণ প্রবীণার। কিন্তু যখন এমন একটি বয়ঃসন্ধিকালে আমরা উপনীত হই, যখন যৌবনে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, সংসারের কঠিন সত্যগুলি কল্পনার ক্লুণরাগকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দেয়, অথচ নিজেকে প্রবীণ বলিয়া পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তখন বোধ হয় বয়োবৃদ্ধের মুখে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির বিবৃতি শুনিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য হয়। ছেলেবেলাকার রূপকথা শুনিবার প্রবৃত্তি কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া এইরূপে প্রকাশ পায় কি না, বলিতে পারি না। পুরাণের কথার আলোচনায় যে মাদকতা আছে তাহাতে আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই পুরাণের কথার মধ্যে আমাদের সমাজের যে স্তরটি লুক্কায়িত

আছে, সেইটিকে যদি লোক-সমক্ষে উন্মেষিত করা যায়, তাহা হইলে হয় ত ঐতিহাসিকেরও কতকটা সাহায্য হইতে পারে।

আজ এই শরতের সায়াহ্নে বীডন উদ্যানের মধ্যে সহস্র বালকের কলকণ্ঠে আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইয়া যাইতেছে। জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—

আজ নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটি'
চেতনা বেদনাবন্ধ।

হঠাৎ শুনিতে পাই, আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজন সপ্ততিবর্ষীয় যুবক,—

ক্ষমা করিবেন। সত্তর বৎসরের যুবক এবং পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বৃদ্ধ দেখেন নাই কি? অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্ল্যাকিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—আপনি যে, এই ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান, আপনার বয়স কত? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন 'I am eighty years young,' 'আমি অশীতিবর্ষীয় যুবক।' তাই বলিতেছিলাম, কয়েকজন সপ্ততিবর্ষীয় যুবক পুরানো কথার আলোচনা করিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে সেই স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর শরতের আকাশ, সেই বিচিত্র জনকোলাহলপূর্ণ

উদ্যান যেন এক মায়ামন্ত্রবলে আমার চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যায়, এবং চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কলিকাতার একটি চিত্র আমার মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কলিকাতার হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা কি সমাজের উপর একটিও রেখাপাত করে নাই? তাহাদের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত আজ বিলুপ্তপ্রায়!

তখন বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরব্ধ হয় নাই; ইল্‌বার্ট বিল সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; আমাদের জমিদার সভার সহিত ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় একযোগে পরামর্শ করিয়া সরকারি বিধিব্যবস্থার সমর্থন ও প্রতিবাদ করিত; তখনও বাঙ্গালী সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাই; তখনও বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজের ফুটবল খেলায় ইংরাজকে পরাভূত করিয়া জয়ধ্বনি করে নাই। কলিকাতার বাঙ্গালী ধনকুবেরগণ ইংরাজের অনুকরণে স্ব স্ব ভবনের প্রাঙ্গনে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইংরাজের অনুকরণে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইল বটে; কিন্তু যে নাটকগুলি অভিনীত হইত, তাহার প্রায় সকলগুলিই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন ও রামনারায়ণ পণ্ডিত তখনকার নাটককার; মাইকেল অন্য হিসাবে সাহিত্যে অমর হইয়াছেন, কিন্তু এখনকার দিনে রামনারায়ণ পণ্ডিতের নাম কয়জন জানে?

ইংরাজের দেখাদেখি বাঙ্গালীরাও তখন আলাদা Race course করিয়াছিল। ঘোড়দৌড় হইত কলিকাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে। অনুষ্ঠানের ত্রুটি ছিল না,—starter ছিল, jockey ছিল, book-maker ছিল, betting ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎ বাবু, লাটু বাবুর (ছাতুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পোষ্যপুত্র মন্মথ বাবু, ও হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনিতেন। শরৎ বাবু নিজেই jockey হইতেন। প্রতিবৎসরে শীতকালে ঘোড়দৌড় হইত।

সখের থিয়েটার, সখের ঘোড়দৌড় বিদেশীর অনুকরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবৎসরে শীতকালে ছাতুবাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হইত, তাহা আমাদের দেশীয় নবাবি আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন যেখানে অনাথবাবুর বাজার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটর প্রভৃতি হইয়াছে, সেখানে কেবলমাত্র একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে খুব ধুমধামের সহিত বুলবুলির লড়াই হইত। অনেক তাঁবু পড়িত। পোস্তার রাজা নরসিংহ দেড়শত শিক্ষিত বুলবুলি লইয়া আসিতেন, ছাতুবাবুও দেড়শত বুলবুলি আনিতেন। উভয় দলের মাঝখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত; সেই খাবার লইয়া তাহাদের লড়াই বাধিয়া যাইত। লড়ায়ে হারিয়া গেলেই পাখী উড়িয়া যাইত, অমনি অন্যদলের লোকেরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিত "বো মারা"। বেলা এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই লড়াই চলিত।

এই সকল দেশী বিদেশী আমোদপ্রমোদের দিনেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার সনাতন ফলাহারের ব্যবস্থা বিস্মরণ করেন নাই। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের রচয়িতা বৈদিক ব্রাহ্মণকুলতিলক পণ্ডিত রামনারায়ণ ফলাহারের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অব্রাহ্মণেরও রসনায় রসসঞ্চার হয়। ৺শারদীয় পূজার প্রাক্কালে একবার সেই ফলাহারের কথা স্মরণ করিলে ক্ষতি কি?

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি,
দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই,
ছোঁকা আর শাকভাজা,
মতিচুর, বোঁদে, খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই।
নিখুঁতি, জিলিপি, গজা,
ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে শক্ শক্ করে নোলা,
হরেক রকম মণ্ডা
যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা।
খুরি পুরি ক্ষীর তায়,
চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়া শুখো দই,

অনন্তর বাম হাতে,
দক্ষিণা পাণের সাথে,
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

এ তো গেল উত্তম ফলার। মধ্যম ফলার কিরূপ ?

সরু চিঁড়ে শুকো দই,
মর্ত্তমান ফাঁকা খই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়,
বৈদিক ব্রাহ্মণে তবে
মধ্যম ফলার কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।

ইহার পরে অধম ফলার। সে কিরূপ ?

গুমো চিঁড়ে, জলো দই,
তেতো গুড়, ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাহি হয়,
রদ্দুরেতে মাথা ফাটে,
হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তারে কয়।

১৮৫৪ সালের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের পর প্রায় ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণের এই ফলাহারের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মতপরিবর্ত্তন হইয়াছে কি ?

পণ্ডিত রামনারায়ণের সহিত ভিখারী কবিচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না বটে, কিন্তু ছাতুবাবুর আসরে কবিচন্দ্র ছাগশিশু সম্বন্ধে

যে গানটি গাহিতেন, বোধ হয় সেটি ফলাহার-প্রসঙ্গে খাপ খাইতে পারে। গানের প্রথমাংশ এই—

ওরে শঙ্করা,
তোর এই পাঁটা কি শির্‌খরা?
কেটে কুটে মোটে মাটে
মাংস হোল এক সরা?
আমরা চার ইয়ারে খেতে ব'সে
হোলো না কো পেটভরা।

অপরাংশে শঙ্করা উত্তর দিতেছে,—

দাম বুঝে দাও,
পাঁটা নাও,
মিছে কেন চোক রাঙ্গাও?
তোমার সবে রেস্ত একটি টাকা,
মস্ত পাঁটা কোথায় পাও?
এ কি লক্ষ টাকার মহাভারত
পাঁচ সিকেতে সার্‌তে চাও?

স্বভাবকবি কবিচন্দ্রকে সকলেই ভালবাসিত। ছাতুবাবু তাঁহাকে গাড়িতে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার পেনেটির বাগান-বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। একদিন উভয়ে বাগানে যাইবার সময় পথে একটা পলায়নতৎপর বলদের পশ্চাতে ধাবমান গোপবৃদ্ধকে দেখিলেন; অমনি ছাতুবাবু কবিচন্দ্রকে বলিলেন, "কবিচন্দ্র, যা

দেখ্‌লে, ঐটি গান কর্‌তে পার?" কবিচন্দ্র বলিলেন, "পার্‌ব না কেন বাবু! তবে শুনুন—

গোয়ালের আগড় ভেঙ্গে
দামড়া গরু পালিয়ে গেল;
পাছে কার গায়ে পড়ে
গয়লা বুড়ো তাই দৌড়াল।
বাহিরে এক ছাগল দেখে,
গুঁতোতে গেল তাকে,
ভাঙ্‌লো তার পায়ে ঠেকে
ঘোলের হাঁড়ি, বাহিরে ছিল।
ভাঙ্‌লো যেই ঘোলের হাঁড়ি,
রাগ্‌লো তায় গয়লা বুড়ী,
নিয়ে এক খ্যাংরা মুড়ি
বুড়োর পিঠে মার্‌তে গেল!

তখন বাচ্‌খেলার বড় ধুম ছিল। এই বাচ্‌খেলা উপলক্ষে হয় ত আজকালকার হিসাবে অনেক রুচিবিগর্হিত ব্যাপার সংঘটিত হইত; বোধ হয় এই রকম কোনও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' তীব্র কশাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাতুবাবুর পেনিটির বাগান-বাড়ীতে যে বাচ্‌খেলা হইত, তাহা অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের বাচ্‌খেলার ন্যায় বিশুদ্ধ sport ছিল। প্রধান পাণ্ডা ছিলেন প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্ন মিত্র। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এড়িয়াদহ-

নিবাসী, পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম করিতেন; ইডেন উদ্যান তাঁহারই তত্ত্বাবধানে করা হয়। মিত্রজ মহাশয় ছিলেন ছাতুবাবুর নাৎ-জামাই। উভয়ে নিজ নিজ নৌকায় বাছাই করা দাঁড়ি মাঝি লইতেন; প্রত্যেক নৌকায় ছয় জন করিয়া দাঁড়ি থাকিত। যে নৌকা জিতিত, তাহার মাঝি এক জোড়া শাল বক্‌সিস পাইত!

* * * *

উদ্যানের বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া যাঁহাদের মুখ হইতে কলিকাতার এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলাম, হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাদের প্রথম যৌবনের এই সকল আমোদ প্রমোদের কথা তোমার হয় ত ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু আমরা কয়জন যে কয়দিন আছি, মাঝে মাঝে আমাদের সেকালের কলিকাতার কথা আবৃত্তি করিয়া তোমাদের কর্ণকুহর ব্যথিত করিব। তাহার পরে সমস্তই মুছিয়া যাইবে। এখনই ত এক প্রকার মুছিয়া গিয়াছে। যাহা চলিয়া যাইতেছে, তোমরা তাহার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছ; মন্দির উঠাইতেছ, পদক দিতেছ, tablet বসাইতেছ, মূর্ত্তি গড়িতেছ। দেখিয়া বড় আনন্দ হয়। বাঙ্গালীর ছেলে, পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও। আপনার হৃদয়ের বিজন কক্ষে পুরাতনের শ্রাদ্ধোৎসব করিলে আনন্দ পাইবে, হৃদয়ে সাহস পাইবে, বাহুতে বল পাইবে, আপনার পায়ে ভর করিতে শিখিবে, ধর্ম্মভীরু হইবে, কর্ম্মে উৎসাহ বাড়িবে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া

দেখিও। যখন চাকরিগত-প্রাণ বাঙ্গালীর ছেলে চাকরি করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, যদি তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া তোমার ধারণা হয়, যদি তাহার এই দম্ভ বৃথা আস্ফালন বলিয়া তোমার মনে না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রামগোপাল ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দিও। বলিও যে স্বয়ং লাট সাহেব,—মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে ছোট লাট বাঙ্গালার মস্‌নদে ছিলেন না,—রামগোপাল ঘোষকে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামগোপাল উত্তর করিল, "চাকরি করিব না;—গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিব না।" লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে তুমি কি করিবে?" উত্তর হইল, "আর কিছু না পারি, কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিয়া জীবিকা অৰ্জ্জন করিব।" বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলেন, সম্পাদক বিস্মিত হইয়া জনৈক বন্ধুকে বলিলেন, "ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে?" কথাটি বিদ্যাসাগরের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, "বোলো, মুদির দোকান ক'রে খাবে।"

বক্তা একটু থামিলেন। আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার কৃশ, গৌর, সরল দেহখানি যেন হোমাগ্নিশিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পুরাতনের অনুকরণ করিতেছ, অথচ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হও যে, অনুকরণ করিতেছ? তোমরা সভা করিয়া কাগজে ছেলেদের স্বাক্ষর লইতেছ, তাহাদের প্রতিজ্ঞা

করাইয়া লইতেছ যেন তাহারা পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ না করে এবং ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করে। তোমাদের বহুপূর্ব্বে প্যারিচরণ সরকার এই রকম সভাসমিতি করিয়া বালক, যুবক, বৃদ্ধের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়াছিলেন, যেন তাঁহারা মদ্য-পান না করেন; তাহাতে সমাজের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তোমরা ত সেই পথ অনুসরণ করিয়া, সেই রকম সভাসমিতি করিয়া (তোমরা league কথাটা পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছ) সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছ। যে এগারজন বাঙ্গালী হিন্দুসন্তান দলে দলে সমাগত গোরা খেলোয়াড়-দিগকে ফুটবলে পরাস্ত করিয়া এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাঁহারা কি পঞ্চবিংশতি-ষোড়শী-পরিণয়ের সন্তান? তুমি হাসিতেছ? কি বলিতেছ? Exception? accident? ষোড়শী চাই? আচ্ছা, তাহাই হউক। কিন্তু সমাজে যে ভূকম্প উপস্থিত হইবে, তাহার আভাষ কিছু পাইতেছ কি? সে ভূকম্পে পুরাতনের একটি বৃহৎ অট্টালিকা তাহার ইট, কাঠ, চুন, সুরকি সমেত ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে! জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহার বিরাট বিপুল কায়া বিরাজিত। সেই একান্নবর্ত্তী পরিবার ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। কি বলিলে? তাহাতে ক্ষতি কি? আবার নূতন করিয়া ইট, কাট, চুন, সুরকি লইয়া নূতন হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিবে? তোমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, "তোমরা কি এতই শক্তিমান?" বেশ,

ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিলে ত ভালই হইতে পারে। তোমরা পাণ্ডিত্যের অভিমান কর, কিন্তু looking before and after কাজ কর কি? পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা তোমাদের হইয়াছে, তাই বোধ হয় looking before টা ভাল রকম হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি---and after? অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান "এম্পায়ার" পত্রিকা হিন্দুর এই বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, শুন ঃ—

Another sign of the times is the suggestion put forward for the need of a Divorce Law for Hindus. It will come, we are convinced, with the passage of time. *

অনেক দেখিলাম, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে। তোমাদের কল্যাণে তাহাও দেখিতে হইবে। চলিতে হইবে চল; কিন্তু ধীরে, ধীরে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট্ একবার বক্তৃতার মুখে বলিয়াছিলেন, "আমরা মার্কিনবাসী নক্ষত্রলোকের দিকে আমাদের মস্তক উন্নত করিয়া চলি বটে, কিন্তু আমাদের পা থাকে নিরেট পৃথিবীর উপর।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু তখন দেখিলাম যে সেই বেঞ্চে উপবিষ্ট আমরা কয় জন ছাড়া আর সে বাগানে কেহ উপস্থিত নাই। হঠাৎ বাক্যের স্রোত বন্ধ হইলে সেই

* ১৯১১ সালের ১৩ই আগষ্টের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় উদ্ধৃত।

চন্দ্রালোকিত উদ্যানের বিজনতা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। আমি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। ভদ্রলোকটি এবার একটু নরম সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পুরাতন কথা কহিতে গিয়া নিজেকে সামলাইতে পারি নাই, বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারি নাই; কিছু মনে করিও না। তোমরা পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছ বৈ কি, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? খাল বিল পুষ্করিণী হইতে প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছ; পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি বাহির করিয়া মুদ্রিত করিবার ভার লইতেছ, হিন্দুর পুরাণ-গুলিকে যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতেছ। বেশ ভাল কাজই করিতেছ। কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি? হারাণ'র মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রীটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাসা করিয়া ছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যা-সাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ্ড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন,

সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে ত, না, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সানবাঁধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীকপুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান্ হইবে; মাটি মাখো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই, অথচ মনে বড় দম্ভ ছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে আমার বাকি নাই। কিন্তু এখন যেন তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কোথাও অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেছি না। তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভাল করিয়া পাইলাম? কলিকাতা পর্য্যটন করিয়া তাঁহার পুরাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত কলিকাতাবাসী ছোট বড় লোক শ্মশানঘাটে যে স্থানে তাঁহার চিতা সাজাইয়াছিল, আমি এক-এক দিন প্রত্যূষে সেই তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র চিতাভস্মের অন্বেষণ করি। হায়, তখন যদি কমণ্ডলু ভরিয়া সেই ভস্ম আনিতে পারিতাম! অনেক দিন তোমার মত অবহিতচিত্ত শ্রোতা পাই নাই, তাই আজ আমার মুখে এত কথা ফুটিয়াছে। আমি বক্তা নহি, আমি বোধ করি এতাবৎ সংসারে কোনও উপকারে আসি নাই; কিন্তু আজ যদি আমার এই কথাগুলি তোমার মনোমধ্যে একটুও চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে ধন্য হইয়া যাইব। যদি কোনও বিজন সন্ধ্যায় সেকালের ছায়া তোমার মনের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে

কৃতার্থ হইব। পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও, মনে বল পাইবে, আনন্দ পাইবে। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিষ।

বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছিলাম, উজ্জ্বলে মধুরে ওরূপ সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি-প্রমুখ মহারথিগণের সহিত যখন তিনি একাকী শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই যোদ্ধৃবেশ আমার মনে পড়ে; আবার যখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইল, সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়। বিদ্যাসাগরের উর্ম্মিসঙ্কুল, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, বাত্যাবিক্ষুব্ধ প্রবাহে একটী স্বচ্ছসলিলা কলস্বনা স্রোতস্বিনী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক ঋষিকল্প রামতনুর কথা স্মরণ করিও। কেমন করিয়া রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, রাজনারায়ণের সমসাময়িক রামতনু লাহিড়ী প্রথম ইংরাজি শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী দোষগুলি এড়াইয়া গিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিয়া দেখিও। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিও। কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে পড়ে। তোমাদের সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে তাঁহার যে সুন্দর প্রতিকৃতিখানি বঙ্কিম বাবুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসাইয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়। বিচিত্র বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত

হইয়াও তিনি যেরূপে আপনার মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মহীয়ান্ হইয়াছিলেন, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে ঘরটিতে কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কয়েকজন বন্ধু লইয়া "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" গঠিত করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে ঘরটিতে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে প্রাঙ্গনে রামনারায়ণ পণ্ডিতের "বেণীসংহার নাটক" অভিনীত হইয়াছিল, সেই প্রাঙ্গনে সেই রাত্রের কথা একটিও ভুলি নাই। যে দিন রেভারেণ্ড লং সাহেবের হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল, সে দিন কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ সেই টাকা আদালতে জমা করিয়া দিলেন, সে কথা তোমরা জান কি?

আজ পুরাতনের মোহ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের যে গোপন কক্ষ গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় নাই, কি জানি আজ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া তোমার সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আমার সমস্ত সঞ্চিত বেদনা আজ এই নিশীথের বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল। আমার এই অফুরাণ কথা কত শুনিবে? ভাষায় কি আমি মনের ভাব ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি? বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে কথাটি বলি বলি মনে করি বলিতে পারি না, পাখী তুই সেই কথাটি বল্ দেখি রে!" আমিও অনেক বকিলাম,

কিন্তু আমি যেটি বলিতে চাহি, সে কথাটি কি গুছাইয়া বলিতে পারিলাম ?

শুধু কথার উপরে কথা,
নিস্ফল ব্যাকুলতা !
বুঝিতে বুঝাতে দিন চলে, যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।
মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না ?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে না ?

১

২৪শে আশ্বিন, ১৩১৭।

তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে নাই; সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিমাকাশের লঘু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ভিতর দিয়া তখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল; অদূরে সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিতেছিল।

বীডন উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—"বোসো"। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম।

দু' একটি কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কখনও কোন বিষয়ে Controversy হইয়াছিল কি?" তিনি বলিলেন—"হাঁ, হইয়াছিল। এ কথা আজ কেন জিজ্ঞাসা করিলে বল দেখি?" আমি বলিলাম—"আমাদের রিপন কলেজের অধ্যাপকদিগের বিশ্রামাগারে আজ এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। আলোচনা করিতেছিলাম আমরা তিন জন—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি। জিতেন বাবু প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। একটু কারণ ছিল। সম্প্রতি 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি পুরাতন চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ৺রাজনারায়ণ

বসুকে লেখা হইয়াছিল। একটি পত্রের একাংশে লেখা আছে,—'কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight and he can slight all things divine!' আমরা কিন্তু আপনার এ রূপ কোনও বাদানুবাদের বিষয় অবগত নহি; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার একবার Controversy হইয়াছিল বটে; সে আজ অনেক দিনের কথা। 'ভারতী' পত্রিকার পুরাতন ফাইল নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে আমার প্রবন্ধগুলি দেখিতে পাইবে। যতদূর স্মরণ হয়, প্রত্যেক প্রবন্ধের নিম্নে আমার নাম দেওয়া আছে। তর্ক উঠিয়াছিল, কোঁতের ধ্রুবদর্শন (Positivism) লইয়া। 'সুপ্রভাতের' যে সংখ্যায় উক্ত বাদানুবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুর পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সংখ্যাখানি আমাকে দেখাইও। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করিতাম না; ওকালতি করিতাম। রাজনারায়ণ বাবু তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন।

"সম্প্রতি জন্ ষ্টুয়াট মিলের সমস্ত চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অনেকদিন পূর্ব্বে যখন কোঁতের চিঠিপত্রগুলি ফরাসি ভাষায় পড়িয়াছিলাম, তখন মনে একটা বড় আকাঙ্ক্ষা হইত যে, ষ্টুয়ার্ট মিলের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তিনি কোঁতের চিঠিগুলির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি পাওয়া যাইত,

তাহা হইলে সেগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা যাইত। কিন্তু এই পত্রগুলির মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছুই পাইলাম না। উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের সম্বন্ধ কেমন রহস্যময় ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যিনি কোঁতের Synthetic Philosophyর আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই, তিনিই আবার সেই প্রবন্ধেই কঠোর সমালোচক হইয়া কোঁৎকে বিদ্রূপ করিয়াছেন! কোঁতের শিষ্য কঙ্গ্রিভ্ মিল্‌কে একখানি পত্র লিখেন। তিনি জানিতে চাহেন, কেন ষ্টুয়ার্ট মিল্ কোঁতের এমন কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতেছেন। তদুত্তরে মিল্ লিখেন—আমি কোঁৎকে খুব শ্রদ্ধা করি; আমার ভয় হয় পাছে তাঁহার মন্দ ও ভ্রান্ত ভাবগুলি তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ভাল অংশটিকে বা নষ্ট করিয়া ফেলে; অথবা তিনি যে সুন্দর সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবচক্ষুকে এমন করিয়া ধাঁধাঁ দিবে যে, লোকে তাঁহার ভ্রমগুলির প্রতি একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে না। সত্য মিথ্যা সকলগুলিই তাহারা নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে।

"তোমরা জান, ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। ষ্টুয়ার্ট্ মিল চাহেন Representative Government এবং Enfranchisement of Women; কোঁৎ ঠিক বিরুদ্ধ মতের পরিপোষক—তাঁহার মতে ও দু'টা ফাঁকা অসার বস্তু। উভয়ে অনেক চিঠি লেখালিখি করিলেন; উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। কোঁৎ হতাশ হইয়া বলিলেন যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন যে,

মিল্ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধ্রুবদর্শন শাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হইতে পারিবেন, এখন দেখিতেছেন, তাহা হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র কোঁতের জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মাষ্টারি চাকরিটি গেল, তাঁহাকে পরীক্ষক নযুক্ত করাও হইল না, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইল, তখন ষ্টুয়ার্টমিল্ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মোল্সওয়ার্থ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্ এবং অন্যান্য বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কোঁতের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইলে পর কোঁতের স্বদেশবাসীরা দরিদ্র দার্শনিককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

কোঁতের এই অর্থকষ্টজনিত দারিদ্র্যের জন্য তিনি নিজে অনেকটা দায়ী। যখন তিনি তাঁহার পুস্তকের এক এক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি Polytechnic School এর কর্ত্তৃপক্ষীয় কোনও না কোনও ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা করিতেন। একবার তাহা লইয়া তাঁহাকে আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে অ্যারাগো নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা, বেশী মাহিনার একটি পদ খালি হইলে, কোঁৎকে তাহা না দিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোঁৎ তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবাদ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর প্রমাদ গণিল; সে দেখিল যে, একজন দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টার অ্যারাগোর ন্যায় একজন ক্ষমতাবান

ব্যক্তির যে কড়া সমালোচনা করিতেছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে মুদ্রাকরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সে প্রতিবাদের কথা অ্যারাগোকে জ্ঞাপন করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা মুদ্রিত হইলে তিনি মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবেন কি? অ্যারাগো বলিলেন, 'আমি বিরক্ত হইব কেন? অঙ্কশাস্ত্রে যাহার কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই,—না সামান্য, না বিশিষ্ট, কোনও প্রকার ব্যুৎপত্তি নাই—এমন একটা লোককে ঐ পদে উন্নীত না করিয়া যদি গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন একজনকে গণিতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্য লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না। দর্শনকার মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তুমি স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করিতে পার।' মুদ্রাকর ও প্রকাশক কোঁৎকে না জানাইয়া তাঁহার পুস্তকের গোড়ায় অ্যারাগোর চিঠিখানি সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কোঁৎ তাহা দেখিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে খেসারৎ পাইলেন।

"এই সব ঝগড়া বিবাদের জন্য স্ত্রীর সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। স্ত্রী প্রায়ই তাঁহাকে এই দ্বন্দ্বকলহ হইতে বিরত হইতে বলিতেন। কাপ্তেনের সহিত কোঁতের স্ত্রীর পলায়ন-ব্যাপারটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি সঠিক অবগত নহি; তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কোঁৎ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু ১৮৪৪ সালে চিরন্তন বিবাদ কলহ উপলক্ষে স্ত্রীপুরুষে আপোষে পৃথক হইলেন। সেই অবধি স্ত্রীর গ্রাসা-

চ্ছাদনের জন্য তিনি নিজের আয় হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার স্ত্রীকে দিতেন। তাঁহার যতই অর্থকষ্ট হউক, ঠিক নিয়মমত এই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক স্ত্রীকে বরাবর দিতেন।

"এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি বিয়াট্রিচি (Beatrice) দেখা দিয়াছিলেন; যুবতীর নাম ক্লোটিল্ড্ (Clotilde)। তাঁহার স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য যাবজ্জীবনস্থায়ী নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যুবতী বিশেষ গুণবতী ছিলেন; দার্শনিক কোঁৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, 'এস আমরা বিবাহ করি। আমাদের উভয়ের সাংসারিক জীবনে যে দারুণ tragedy হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর এ বিবাহে কোনও দোষ আছে কি না। ক্লোটিল্ড্ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সামাজিকনীতিবিরুদ্ধ এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। অতি অল্পদিন পরেই ক্লোটিল্ড্ ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন; কোঁৎ তাঁহার Positive Politics বা ধ্রুবরাজনীতি নামক প্রকাণ্ড পুস্তকখানি ক্লোটিল্ডের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ক্লোটিল্ডের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার জীবন কেবল দর্শনশাস্ত্রসৃষ্টি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত। তিনি যে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারিয়াছেন তাহা শুধু এক বৎসর কাল ক্লোটিল্ডের সহিত আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার ফলে।

"বোধ হয়, এই প্রসঙ্গে আমার একটি নিজের কথা বলিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্লোটিল্ড্-কোঁৎ-ব্যাপার

অবলম্বন করিয়া ক্লোটিল্‌ডের বিরচিত Lucie নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দৃষ্টে আমি একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম। আমার পরম আত্মীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ কর।' পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার নাম দিয়া এই গল্প প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে। তখন আমার জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমার স্বাক্ষরিত গল্পটি প্রকাশিত হইলে লোকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করিবে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া ছাপাখানায় উপস্থিত হইলাম; সমস্ত টাইপ্‌গুলি ওলোট্ পালোট্ করিয়া দিয়া গল্পটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম; তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। পরে বিহারীর নিকট আমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর কখনও এরূপে আমার লেখা নষ্ট হয় নাই। ফরাসী ভাষা হইতে পল-বর্জ্জিনিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলাম। বোনাপার্টের জীবন-চরিত অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত। কবিতাও লিখিতাম।

"ষ্টুয়ার্ট মিল্ ও মিসেস্ টেলরের প্রণয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয় জানা আছে; এই যে মিলের চিঠিপত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক বিষয় পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী টেলরও মিলের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার নারী-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, পূজারিণীর ন্যায়

মিলের চরণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন, মানুষ যে কতদূর perfectionএ পৌঁছিতে পারে, তাহা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বামীর নিকট গোপন করেন নাই। সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। স্বামী বলিলেন,—'তাই ত, ইহার একটা বিধান করিতে পারা যায় না কি? ব্যাপারটা ত ভাল নয়! একটা কায করা যাক্‌,—তুমি এখন প্যারিসে গিয়া থাক না কেন? দিনকতক ছাড়াছাড়ি হইলে এ নেশা কাটিয়া যাইতে পারে।' অনেক বিবেচনা করিয়া প্যারিসে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীমতী টেলর তাঁহার স্বামীকে লিখিলেন—'আমার পক্ষে এখানে থাকা নিরর্থক, ইহাতে কোনও ফল দর্শিবে না, অনুমতি কর ত ফিরিয়া যাই।' তাহাই হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সামাজিক হিসাবে এই অবৈধ সম্বন্ধ লইয়া কোনও scandal, কোনও লোকাপবাদ হইবার কোনও কথাই ছিল না। তবে মিলের পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পরস্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি অতীব গর্হিত।"

পণ্ডিত মহাশয় একটু থামিলেন। আমি বলিলাম "এ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ Platonic ছিল বোধ হয়?"

"হাঁ তাহাই বটে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ সম্বন্ধে পাশবতা ছিল কি না সন্দেহ; intellectual fascination অত্যন্ত প্রবল ছিল। ক্লোটিল্‌ড্‌ ও কোঁৎ ঠিক ঐ রকম ভাবেই কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মিষ্টার টেলর উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি

তাঁহার স্ত্রীকে দান করিয়া যান। বিধবা হইবার প্রায় আড়াই বৎসর পরে মিসেস্ টেলর মিল্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিবাহের পর বেশি দিন মিসেস্ টেলর জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেলেন টেলর মিলের মৃত্যু পর্য্যন্ত কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। হেলেন সেই জন্য আজীবন কুমারীব্রত পালন করিলেন। অ্যাভিনিয়নের (Avignon) নিকটবর্ত্তী যে স্থানে মিসেস্ টেলরের সমাধি হইয়াছিল, মিল্ তাহারই অতি নিকটে একটি বাগানবাড়ীতে শেষজীবন অতিবাহিত করিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি চিঠিপত্র লেখা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, ঠিক সেস্থান হইতে তাঁহার স্ত্রীর গোর দেখা যাইত। হেলেনও বিদুষী ছিলেন; মিলের অনেক চিঠি পত্র তিনি লিখিয়া দিতেন; মিল কেবল দেখিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

"এক একবার আমার সন্দেহ হয় যে, পিতাপুত্রের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, জেম্‌স্ মিলের না জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের? কেমন করিয়া যে তিনি তিন বৎসরের শিশুকে গ্রীক্ শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। তুমি যে অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন polite educationএর প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেছ, তাহার সহিত জেম্‌স্ মিলের এ শিশু পুত্রের অধ্যাপনার কোনও বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জেম্‌স্ মিল নিজে একজন মুচির ছেলে। সেই মুচি কিন্তু নিজের ছেলেটিকে নিজের ব্যবসায় হইতে দূরে রাখিয়া

ভদ্রলোকের ছেলের মত তাহার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও জেম্‌স্‌কে অনেক দিন অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বেন্থামের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। পরে যখন তাঁহার ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি হইল, সেই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝা গেল।

"এত কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের দুইটি বড় কায করিয়া ফেলিয়াছিলেন;—ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শেষ করিলেন। দেখ, আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল; আমার বিশ্বাস ছিল যে জেমস্ মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করার পর তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজ-পত্র দেখিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। এখন আমার সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে; এখন দেখিতেছি যে, ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইতিহাস-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ছেলেটিকে লইয়া যখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, তখন মুখে মুখে তাহাকে অর্থশাস্ত্র (Economics) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বালক পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতাকে দেখাইত; মনের মত না হইলে বালকের উপর আবার লিখিবার

আদেশ হইত। এমনই করিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স মিলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ পর্য্যন্ত মিল্ চাকরি করিয়া বাৎসরিক পনের শত পাউণ্ড পেন্সন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

"পার্লামেণ্ট প্রবেশ করিবার জন্য যখন মিলকে অনুরোধ করা হয়, তিনি বলিলেন আমি candidate হইতে রাজি আছি, কিন্তু এক পয়সাও খরচ করিব না। কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। একবার তিনি মেম্বর হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বারের সময় লোকে সন্দেহ করিল যে, তিনি ব্র্যাডলকে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মিল্ কিন্তু নিজে বলিতেন যে, ব্র্যাডল ঘটিত ব্যাপারে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের Organisation ভাল ছিল না। তাই তিনি হটিয়া গেলেন।

"কার্লাইলের সম্বন্ধে মিলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি লিখিয়াছেন যে, মানবের মনোবিকাশের খানিক দূর পর্য্যন্ত কার্লাইলকে পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে; একটু উপরে উঠিলে আর চলিবে না। তবে তখনও কার্লাইলের রচনা পাঠে অনেক আনন্দ অনুভব করা যায়। তিনি কার্লাইলের হস্তলিখিত পুঁথি French Revolution খানি হারাইয়া ফেলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া কার্লাইলকে পুনশ্চ ঐ গ্রন্থ

লিখিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কার্লাইলের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে জোর করিয়া টাকা দিলেন। কার্লাইল্ তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"গ্ল্যাড্ষ্টোন্ সম্বন্ধে মিল্ একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি যথার্থই বড় লোক হইতেন তাহা হইলে কখনই Franco-Prussian যুদ্ধ হইতে দিতেন না। তিনি যদি বলিতেন যে, ফরাসি ও প্রুসিয়ার মধ্যে যে প্রথমে সৈন্য-চালনা পূর্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমস্ত নৌবাহিনীর অভিযান হইবে, তাহা হইলে কি ঐ যুদ্ধ বাধিতে পারিত?

"দেখ, কার্লাইলের স্ত্রীর সহিত যে মতের অনৈক্য ও বিরোধের কথা ফ্রুড প্রচার করিয়াছেন, সেটা না কি ঠিক নয়। দম্পতীর মধ্যে না কি প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মিলের পত্রে কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

"তাঁহার কয়েকখানা পত্রে হার্বার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক মত লইয়া অনেক তীব্র সমালোচনা আছে; পাঠ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। স্পেন্সরের Relativity ও Conservation of Energy এ দুটির কোনটিই তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার Universal Postulate মিলের একবারেই অসহ্য।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী Dr. Martineau তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, 'আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আপনার পক্ষ সমর্থন

করিলে আর এক জনকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি অনেকটা আমার দার্শনিক মতের পরিপোষক। আমার মতাবলম্বী লোক অল্প; আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।"

বীডন্ উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে লক্ষ্য করি নাই যে, একে একে প্রায় সকল ভদ্রলোকই উদ্যান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান পণ্ডিত মহাশয়কে সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজি, বহুৎ রাৎ হুয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। একটু দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন—"যে পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সে পত্রিকাখানা আমাকে একবার দেখাইও। আমার মনে হয়, ভগবানকে লইয়া তর্ক হইয়াছিল; আমি বোধ হয় বলিয়াছিলাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (omniscient) তাঁহাকে all-merciful বলা কিছুতেই যায় না। এই কথাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্র বাবু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমার ঐকমত্য দেখিতে পাইবে। মিল্ বলিতেন, ঐ তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ কল্পনা করা যাইতে পারে না; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভালর দিকে ঝোঁক—a tendency towards the good—কল্পনা করা যাইতে পারে; তেমনই একটা মন্দের দিকে ঝোঁকও কি কল্পনা

করা যাইতে পারে না? কোঁৎ বলেন যে, ভগবানকে একেবারে বাদ দিতে হইবে; যাহা বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় তাহাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া জ্ঞানের পথ রোধ করিও না। অবশ্যই theology জগতে কতকটা উপকার সাধন করিয়াছে,—সমাজের কল্যাণকার্য্যে অনেকটা পুলিশ প্রহরীর মত কায করিয়া আসিতেছে; কিন্তু theologyর দিন চলিয়া গিয়াছে।

গৃহে ফিরিবার সময় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের একটি ছত্র আমার মনে হইতে লাগিল—"he can write, and he can fight, and he can slight all things divine!"

২

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৭।

আজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম, "রামেন্দ্র বাবুর বিশেষ অনুরোধ যে, আমি আপনার পুরাতন কাহিনী শুনিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আপনি স্বয়ং লিখিতে পারিবেন না; আপনার নিকট শুনিয়া আমি আপনার কথাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে শুনাইব; পরে আপনার কথামত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় Men I have seen প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেছেন; আপনার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিল; আমরা মনে করি, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যাহা অন্য কেহ পারিবেন না। ৺জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক দিন অনেক কথা শুনিয়াছি; আজ সেই গুলি ভাল করিয়া শুনিয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া আরও দশ জনকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি ঠিক ধারাবাহিক একটানা বলিতে পারিব কি? কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টা কথা বলিয়া যাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিরূপে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।

"তখনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই; একটা Council of Education ছিল। সেই কাউন্সিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,—তাঁহার নাম রসময় দত্ত। রসময় বাবু Small Cause Court এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়; তিনি সমস্ত দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল এক শত টাকা; বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

"ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ

পণ্ডিতের পিতৃব্য। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল। ইস্কুলে যাইবার সময় ও ইস্কুল হইতে আসিবার সময় পথে দাদার কাছে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতাম।

"ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেক দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়াছিলাম। রসময় বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন না কি বলিয়াছিলেন,—'ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খা'বে কি করে?' কথাটা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাণে পৌছিল, তখন তিনি বলিলেন—'বোলো, মুদির দোকান কোরে খাবে!'

"সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চাকরি পাইলেন। মাসিক বেতন আশী টাকা। এই সময়ে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

"কিছুদিনের মধ্যে বীটন্ সাহেবের (J. Drinkwater Bethune) সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বীটন্ সাহেব তখন কাউন্সিল অভ্ এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা করিলেন; সম্পাদক ও

সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; মাসিক বেতন তিন শত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও পাচ ছয় বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম।

"এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে :—

১। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, বর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর ছেলেমাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।

২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া 'উপক্রমণিকা' পড়ান আরম্ভ হইল।

৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এত দিন ছাত্রেরা ইচ্ছামত ইংরাজি মাষ্টারের কাছে অধ্যয়ন করিত। দুইজন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন; ছেলেদের ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের কাছে অধ্যয়ন করিত। এখন হইতে ইংরাজি পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

৫। সংস্কৃত গণিত—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল; ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল। অঙ্কের

অধ্যাপক হইলেন শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।

"এই সকল পরিবর্ত্তন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না।

"নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatchএর ফলে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের ভাঙ্গাগড়া হইল। শিক্ষাবিভাগের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইস্কুল স্থাপিত হইল, ইস্কুলের ইনস্পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রহিলেন এবং ইস্কুলের পরিদর্শক হইলেন। এখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল পাচ শত টাকা। সেই সময় সংস্কৃত কলেজে একজন সহকারী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন।

"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্ন বাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন। আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা—বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ

গুণীতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যের নাম এই জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালার ভূগোল লিখিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই terminology প্রচলিত। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়,—

(১) জীবন চরিত—Chamber's Biographyর অনুবাদ।

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—Marshman এর অনুবাদ।

(৩) মহাভারতের উপক্রমণিকা।

(৪) বোধোদয়।

(৫) ব্যাকরণকৌমুদী।

(৬) ঋজুপাঠ।

(৭) Expurgated রঘু, কুমার, ভারবী, মাঘ।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দেবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম। এই রকম একগুঁয়েপনা আমার বরাবর রহিয়া গেল।

ভবিষ্যতে এমন অনেকবার আমি শুধু যে তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছি তাহাই নহে, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেক কড়া কথা লিখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার 'বিচিত্রবীর্য্যে'র প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাই আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমার বহিখানি পড়িতে অনুরোধ করি। মাস তিনেক পরে বহিখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—'ওরে, আমার এমন সময় হচ্চে না যে, তোর বইখানা পড়ি।' আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byronএর English Bards and Scotch Reviewersএর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে। ষোলো সতের বৎসর বয়সে "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম।

যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উদ্দাম,
লিখেছিনু গল্প এক "দুরাকাঙ্ক্ষ" নাম।
পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি,
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি,
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ,
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।

এইরূপে সবে তার নিন্দা একটি করে,
পয়সা দিয়া কিনিল না কেহই সাদরে।
তা' বোলে কি ছেড়ে দিব লেখা একেবারে,
যখন বোকার দল ঘেরিল সংসারে?
ক অক্ষর গোমাংস যাহাদের পেটে,
বানান করিতে যারা মরে দম ফেটে,
যা' দি'কে দেখিলে মোরে দংশে যেন অহি,
এরূপ লোকের সব বিকাইছে বহি!

কবিতার মধ্যে বাল্মিকীর কথা আসিয়া পড়িল,—

নরমুণ্ড জমা করি যে করিত স্তূপ,
যে ছিল জঙ্গলা পথে ডাকাইত ভূপ,

* * * *

সে বাল্মিকী বহুকাল করিয়া কঠোর,
রামায়ণে করে মোহ-রজনীর ভোর।

কালিদাসের কথাও পাড়িলাম,—

যখন যে ডালে বসে কাটে সেই ডাল,
কালিদাস তপোবলে হোলো সুকপাল।

সকলেরই কপাল খুলিল, আমারই কেবল কপাল খুলিল না! হাম্‌লেটের কথাগুলি আমার মস্তিষ্ককে যেন নাড়াচাড়া দিতে লাগিল। আমি ও আবৃত্তি করিয়া লইলাম,—

সুখদুঃখশবলিত এই যে জীবন,
যাহারে সকলে কহে অমূল্য রতন,

অশেষ যন্ত্রণাজাল যাহে ঘেরিয়াছে,
দণ্ডধারী যম যার ধাইতেছে পাছে,
কষ্টসিন্ধুতরঙ্গে যা হয় বিলোড়ন,
দৈব যদুপরি করে বিশিখ বর্ষণ,
লোকে কেন এরে ইচ্ছা করি নাহি ছাড়ে,
কেন নাহি ফেলে দেয় মরণের গাড়ে?
মরণ নিদ্রায় সুখে হইয়া শয়ান
বিস্মৃতিকুহরে লীন হইবেক প্রাণ।
সে নিদ্রার ভিতরেতে আছে কি স্বপন?
আর কি চেতনা হয় প্রাণের তখন?
এই ভাবি লোকে নাহি হয় আত্মঘাতী,
এই ভাবি বর্ত্তমান লয় মাথা পাতি।
নতুবা কে বল দেখি বাঁচিতে চাহিত,
জীবন দুর্ব্বহ ভার বল কে বহিত,—
যখন খুলিয়া এক নিশিত কৃপাণ
সমুদয় দুঃখবহ্নি হইত নির্ব্বাণ।

পরক্ষণেই বায়রণকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—

তাদৃশ ক্ষমতালব যদিও না ধরি,
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি।
কখনও মাছের* মত মারহ ঠোক্কর
দু' এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর।

---

* বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক পত্রিকাতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম Roach ও Dace বিলাতের দুই প্রকার মাছ।

গাধারে পিটিলে কভু হয় নাকি ঘোড়া ?
লুই কি ধোয়ালে হয় গঙ্গাজলে জোড়া ?
হাজার সাধনা কিম্বা করিলে প্রয়াস
মূর্খ কভু নাহি পায় লিখিয়া সাবাস ॥

"ঐ পয়ারটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশ করি নাই।

"আমি সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার বৎসর খানেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও হইল না। কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন।

"এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম। পরে ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ দিলাম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সুতরাং আমাকে চাকরি করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর হইলাম। ইন্স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার স্ত্রীও বিদুষী ছিলেন। ফরাসী ভাষায় লেখা বহি আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি আমার উচ্চারণের বড় প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে কখনও মাথা হেঁট করিতাম না। সেটা যে চাকরির পক্ষে ভাল, তাহা বলিতেছি না। অনেক সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম। এই যে ভাব, এটা

আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত নিবিড় ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল। এখন অনেক বয়স হইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে তৎকালে আমার যে এই প্রকার বৃত্তি ছিল, তাহা কেবল মূর্খতামূলক এবং অনভিজ্ঞতাজনিত। এখন আমি ভাবিয়া লজ্জিত হই যে, সেই মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতা-বশতঃ আমার হিতৈষী অনেক ব্যক্তির প্রতি যে প্রকার কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন করা উচিত ছিল তাহা আমার করা হয় নাই। ইংরাজিতে যে একটা কথা আছে Might have been আমার তাৎকালিক পূর্ব্বোক্ত আচরণ সেই কথারই একটি উদাহরণস্বরূপ। উড্রো সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন,—'এস, আমার গাড়ীতে এস। তোমার বাড়ি অনেক দূর, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাব।' আমি বলিলাম,—'No, thank you, I shall walk home'. তিনি আমাকে তাঁহার নিজের খরচে বিলেত পাঠাইবার মৎলব করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি সিভিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা পাশ করিয়া আসি। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ হিসাব করিয়া দেখা গেল, তখন সিভিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দেওয়ার বয়সের যে নিয়ম ছিল, আমার পরীক্ষা দিবার সময় তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের Junior Professor of Vernacular পদে নিযুক্ত হইলাম। ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior

Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন, আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে Junior Professor করাইয়া দিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়দর্শন,' হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী,' 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিচেল সাহেব হিন্দুদর্শনের উপর স্বতন্ত্র দুইটি Prize Essay লিখিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্দর্ভের নাম Dialogues on Hindu Philosophy. মিচেল সাহেবই প্রাইজ পাইলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের সেই dialogueগুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়া নানা খণ্ডে ষড়দর্শন সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সন্দর্ভ, চিন্তাতরঙ্গিনী, মেঘনাদবধ, বেকনের সন্দর্ভ, ও লালমোহনের অলঙ্কারনির্ণয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়াছিলাম। তখন পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতি (Text-book Committee) ছিল না।

"হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে বোধ হয় আমিই পরিচিত করি। হাওড়ার হিতকরী পত্রিকায় আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র সমালোচনা করিয়া তাহার ভালমন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byronএর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জ্জনা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই।

আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ'ও কলেজে পড়ান হইত। রাসবিহারী (Dr. Ghose) শুধু এই বইখানা পড়িয়া বি, এ, পাশ হইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে এক দিন রাসবিহারী আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, আমি বাংলা কিছুই জানিনা, অথচ বাংলার paperএ আমি ফাঁকি দিয়া আপনার নিকট হইতে full number লইয়াছি। আমি কহিলাম—'এখন তুমি ও কথা বলিতেছ, কিন্তু তখন পরীক্ষা পাশ হ'বার গরজে বেকনের সন্দর্ভখানি খুব ভালরূপই আয়ত্ত করিয়াছিলে' তাই full number পাইয়াছ। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে যদি কোন বিষয়ে মন দিয়া লাগে তাহা হইলে কি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে ?

"শুধু বাঙ্গালা পড়াইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। কাউয়েল্ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটু একটু সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল একবারেই কাদম্বরী আরম্ভ করি। সাহেব বলিলেন, 'ওটা too ambitious'। কাযেই ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ লইয়া সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইল। ক্রমে 'কুমার' 'বেণীসংহার' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইল।

"বাঙ্গালা পড়ুয়ার শেষ দলের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী; সংস্কৃত পড়ুয়ার প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন সারদাচরণ মিত্র।

"রাসবিহারীর এক বৎসর পূর্ব্বে গুরুদাস পড়িয়াছিলেন। মেঘনাদবধ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। গুরুদাস বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা

সাক্ষাৎ হইলে আমি গ্রন্থের কোন স্থান কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইয়া দেন। আমি অবশ্য সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু অত বড় এক ব্যক্তি তাঁহার বাল্য-কালে,—একপ্রকার ক খ শিখিবার সময়ে বলিলেই হয়, আমার নিকট কখন কি শুনিয়া যে মনে রাখিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমার অবশ্যই বিশেষ প্রীতিলাভ হয়।

"সারদা খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়াছিল; ৺তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির 'আশুবোধ ব্যাকরণ' একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই প্রায় পলাইত; সারদার পড়ার আগ্রহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম,—যেমন ইংরাজি সাহিত্যে, তেমনই সংস্কৃতে।

"আমার ছাত্রদিগের আমি পরীক্ষক হই, এটা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি স্বেচ্ছায় পরীক্ষক হইলাম না। সেইবার হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার ছাত্রেরা খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিত; সারদা সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পারিয়া উঠিত না।

কেহ কেহ মনে করেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলাম কারণ তৎকালে Principal Sutcliffe সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও হয় নাই। লোকের এই ধারণাটি কিন্তু নিতান্ত অমূলক। আমি মুক্তকণ্ঠে অম্লানবদনে বলিতে পারি যে, যে দশ বৎসর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি

করিয়াছিলাম বরাবরই সাহেব আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন; একদিনের তরেও কখনও কথান্তর হয় নাই। যদিও আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করি নাই, তথাপি তিনি জানিতেন আমি তাঁহার ছাত্রদিগের সমসাময়িক ও সমকক্ষ, এবং চিরকালই আমার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেন। যখন আমি পদত্যাগ করি, তাহার পূর্ব্বেই আমি সে বিষয়ের অগ্রসংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পরিবারে এক ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। একথা শুনিয়াও সাহেব লোক পাঠাইলেন; পুনঃ পুনঃ আমাকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে আমি আবার আসিয়া চাকরি রক্ষা করি। কিন্তু আমি আর তাহা করিলাম না।

৩

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আজ প্রথমেই বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম, "দেখুন, তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর ত দয়ার সাগর বটেই; কিন্তু তাঁহার intellect এর দিক হইতে তিনি আপনার নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, আজ সেই কথা আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাঁহার সাধারণ কথাবার্ত্তা কিরূপ ছিল?"

তিনি বলিলেন—"কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না— 'ফ্যাপাতূড়ো খাওয়া' (to be confounded) 'দহরম মহরম,' 'বনিবনাও' 'বিধঘুটে' 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত।

যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সাধারণ কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে, তিনিও সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন; অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না; উহা একেবারে ভুল।

"একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায় শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness *per se*। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি এই;—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ,

আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই সহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা কর্‌লেই পার্‌তেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপ-যোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

"আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দিতে জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণভ্রষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এ দিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে নীলাম্বরের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই হিন্দুস্থানী পণ্ডিতটির কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লেখা অসম্ভব, যাহা লেখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; তিনি 'উত্তরচরিত,' 'শকুন্তলা' ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন।

তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।

"একদিন কালিদাস ও সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন এ কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেম বাবুর 'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি' এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'হেম বাবুর এ কথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।' আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে হেম বাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ব্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—'বটেই ত, খেতে, বস্‌তে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।'

"বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা-সাহিত্য-গঠনে কি প্রকার বিকাশ পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎসংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে; নহিলে শ্যামাচরণ

সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারা-শঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহারা প্রত্যেকেই সাহিত্যের,—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে-ছিল সেই সাহিত্যের,—এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপ-যুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন; একা বিদ্যা-সাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

"শ্যামাচরণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ল্যাটিন ও গ্রীক্ জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ করি-তেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনী ভুজঙ্গঃ (the fancyman of eighteen courtezans of languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জ্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaediaতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাশাপাশি ছাপা হইয়াছিল। ইংরাজি তাঁহার নিজের রচনা ছিল না। বামপৃষ্ঠে কোনও ইংরাজি গ্রন্থ, দক্ষিণ পৃষ্ঠে তাঁহার রচিত বাঙ্গালা অনুবাদ, এই প্রণালীতে ঐ পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক Quote করে।'

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখ্‌তে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা' সংস্কৃতশাস্ত্রে।' ইহাতে সাহেবেরা মনে ভাবেন—বাস্‌ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে!' এইরূপ কোনও এক আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই; তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য; তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান; কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধ এই জন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা

অক্ষয়কুমার দত্ত।

দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।" রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" কোথায় ভাসিয়া গেল!

"ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখ্‌তে টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের Style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তার' প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য

জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

"কুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে (Bethune College) নিজের মেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবেরা অত্যন্ত খুসী হইলেন। মদনমোহন স্কুল ছাড়িয়া 'জজের পণ্ডিত' হইলেন, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। তখনকার এই 'জজের পণ্ডিত' একজন Law officer, জজদিগকে Hindu Law ব্যাখ্যা করিয়া দিবার ভার তাঁহার উপর ছিল। কিছুকাল পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না। সাহিত্যচর্চ্চা হইতে তিনি তফাৎ হইয়া পড়িলেন।

"মদনমোহন প্রবাস হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে সংস্কৃত কলেজে বেড়াইতে আসিতেন। বহরমপুর হইতে আসিয়া একদিন তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তখন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ক্লাসে পড়ি। তর্কবাগীশ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও দেশের লোকজন কেমন? ভদ্র লোকের মতন বটে?' মদনমোহন উত্তর করিলেন, 'মহাশয়, সে কথা বলিবেন না; অধিকাংশ লোক এরূপ যে, শাঠ্য লাম্পট্য, কাপট্য, ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটিমাত্র নাই।' ফলতঃ সংস্কৃত সুদীর্ঘশব্দঘটা যেন মদনমোহনের তুণ্ডাগ্রে সর্ব্বদা বিদ্যমান

ছিল। তিনি যেন সে বিষয়ে এক জন স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন।

আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্যশেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিদ্যাসাগর ও শেমুসী (আভিধানিক শব্দ — বুদ্ধি) শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার বাসবদত্তা নামক পদ্যগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।

"বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।

এই সময়ে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরীর' এবং হরিনাথ শর্ম্মা 'মুদ্রা-রাক্ষসের' বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

৪

১৫ই কার্ত্তিক, ১৩১৭।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "৺দ্বারকানাথ মিত্রের কথা আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহ; সে ত আর এক ঘণ্টার কর্ম্ম নহে। এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺দ্বারকানথে মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect, আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতি না করিলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায় না, এই নিয়ম না থাকিলে তিনি যে আরও পূর্ব্বে জজ হইতেন না, এমন কথা বলা যায় না। গ্রে সাহেব তখন বাঙ্গালার ছোটলাট; সার বার্ণ্‌স্ পীকক্ হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি। যখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইবেন, তখন হঠাৎ একদিন লাট সাহেব দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন, 'আপনার হাইকোর্টের জজ হইতে আপত্তি আছে কি?' দ্বারি বাবু উত্তর করিলেন, 'না।' লাট সাহেব বলিলেন 'Did you apply for the post ?' উত্তর হইল 'No, I thought

that these appointments did not go by application.' কয়েক দিবস পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইলেন।

"তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, আমার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। প্রেসেডেন্সি কলেজে যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দ্বারি বাবু শুনিয়াছিলেন যে, আমি কিছু কিছু কোঁৎ পড়িতাম; তাই আমার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়; দ্বারি বাবু তৎকালে কোঁতের পাকা শিষ্য হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬৫ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। ওকালতিতে তখন দ্বারি বাবুর খুব প্রতিপত্তি। রাইয়ৎদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মোকদ্দমা তিনি চালাইয়াছিলেন, সেটা The Great Rent Case নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পীকক্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। দ্বারি বাবু দশ বৎসর ওকালতি করিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কোঁতের এক Chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না। বেলা আটটা নয়টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিতেন। বেড়ান কি অন্য কোন রূপ ব্যায়াম তাঁহার ছিল না; আদালতে যাওয়া আসা গাড়ীতেই হইত। তিনি পাশা খেলিতে খুব ভাল বাসিতেন, দাবাও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন, কিন্তু পাশাই খুব বেশী খেলিতেন।

"জজ হইয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত বসিতেন। তিনি বলিতেন, 'দেখুন, আমি চিফ্‌এর সঙ্গে বোসে অনেক শিখ্‌চি।' সার বার্ণ্‌স্‌ও প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত আইন অধ্যয়ন করিতেন। দ্বারি বাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। যে দিন একটা ইংরাজি পত্রে জনৈক শ্বেতাঙ্গ দ্বারি বাবুর তথা হাইকোর্টের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে সার বার্ণ্‌স্‌ দ্বারি বাবুকে ডাকাইয়া সেই অপরাধীর নামে এক পরোয়ানা জারি করিলেন। সাহেবকে ধরিয়া আনা হইলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"সার বার্ণ্‌স্‌ কার্য্য হইতে অবসর লইলে একবার হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত দ্বারি বাবুর মনোবাদ হয়। তিনি আমায় বলিতেন, 'দেখুন, Resignation (পদত্যাগপত্র) আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে দোবো।' আদালতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিচারপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একবার তর্কস্থলে সার লুইস্‌ জ্যাক্‌সন 'But my dear fellow' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'I protest against being addressed in that way.' জ্যাক্‌সন্‌ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দ্বারি বাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ করেন, এই জ্যাক্‌সন্‌ সাহেব জজদিগের তরফ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই। প্রধান

বিচারপতি সার রিচার্ড কাউচ আইনসম্পর্কীয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; তাই শোক-প্রকাশ করিবার ভার জ্যাক্‌সন্ সাহেবের উপর পড়িয়াছিল। আমি সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলাম। এখনও জ্যাক্‌সন সাহেবের কথাগুলি আমার বেশ মনে পড়ে।

"ইংরাজী সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখনকার দিনে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিতে পারা বড় সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি হুগলি কলেজ হইতে হিন্দুকলেজে আসিয়া কিছুদিন পরে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি Alison's Europeএর আট ভলুম আট দিনে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন যে, অঙ্কেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন; অন্যায় করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইল। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, হলে একজন পরীক্ষক উক্ত ছাত্রের খাতায় অঙ্ক কসিয়া দিলেন। এখন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

"কোঁতের দর্শনশাস্ত্র যে দ্বারি বাবুর জীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক কোঁৎ দ্বারি বাবুর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলই বলিতেন যে, হয় আমরা কোঁৎকে সমগ্র মানব-সমাজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব, নহে ত মানব

সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ষ্টুয়ার্ট মিলও এক দিন এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র মানবসমষ্টির পূজা একটি অত্যন্ত সুন্দর ideal। দ্বারি বাবুকে মিলের মত নাস্তিক না বলিয়া আমি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলিতে চাহি। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না।

"কোঁতের পুস্তক যখন তিনি পড়েন নাই, তখন প্রথম নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; কিন্তু পড়িয়াই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। কোঁৎ নেপোলিয়ানকে যেরূপ গালি দিয়াছেন, বোধ হয় আর কেহই সেরূপ দেয় নাই। দ্বারি বাবুও শেষাশেষি নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। Franco-Prussian War এর সময় যে দিন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, সেডান্ ক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট দেড়লক্ষ ফৌজের সহিত বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে দিন দ্বারি বাবুর প্রাণে যেন একটা ছট্‌ফটানির মত দেখিলাম; তিনি ঘৃণায় কর্সিকার ও কর্সিকার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করিয়া চৌদ্দ পুরুষান্ত করিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ক্রোধের তীক্ষ্ণতা মনে করিলে এখনও আমার হাসি আসে।

কোঁৎ তিন প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:— প্রথমতঃ Civil marriage, এ স্থলে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র; দম্পতীর অমিল হইলে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ Religious marriage, এ সম্বন্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ, ইহা চিরদিনের

জন্য অবিচ্ছিন্ন; বিপত্নীক কিম্বা বিধবা কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। আর এক প্রকার বিবাহকে তিনি Chaste marriage আখ্যা দিয়াছিলেন, এ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ সম্বদ্ধ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ সহবাস করিবে না;—হয় ত শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি এমন কিছু আছে যাহা সন্তানের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

"কোঁতের ভক্ত শিষ্য দ্বারি বাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যতঃ কোঁতের আজ্ঞা এক প্রকার উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহা কর্ত্তৃক করা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র দোষ-প্রক্ষালন স্বরূপ বলিতেন, 'কি করি? প্রতিদিন আহারের সময় মা নিকটে আসিয়া চোখের জল ফেলেন; আর কত দিন মা'র এই ভাব দেখিতে পারি? কিন্তু আমার দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার গুরুদেবের উপর দোষস্পর্শ হওয়া ত উচিত নয়।' তদুত্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম, 'লোকে বোলবে কি জানেন?—যে doctrine লোকের conduct inspire কোর্‌তে না পারে তা'র value কি?'

"প্যাট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু কিছু পান-দোষ ছিল। সেই দেখাদেখি go-ahead যুবকের দলের অনেকে মদ খাইতে শিখিয়াছিলেন; বোধ হয় দ্বারিবাবুও প্রথম তাঁহাদেরই দলের একজন হইয়াছিলেন। কিন্তু কোঁতের পুস্তক পাঠ করার পর তিনি মদ একেবারে ত্যাগ করিলেন। অনেক

দিন পর্য্যন্ত তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই ; কিন্তু শেষাশেষি তিনি পুনরায় মদ ধরিয়াছিলেন। কোঁতের নিষেধ যে তিনি এতদিন মানিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

"Distinction of function অর্থাৎ অধিকারভেদ কোঁতের একটি প্রধান কথা। Temporal Power ও Spiritual Power স্বতন্ত্র হওয়া চাহি, ইহা তাঁহার দর্শনের Cardinal Point। দ্বারিবাবুও বোধ হয় সকল বিষয়েই এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, Legislator এবং Judge দুইজনের কায সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। একবার লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটা আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের মত জানিতে চাওয়া হয়। দ্বারিবাবু মত দেন নাই। তিনি লিখিলেন, "It is not my function ;—My function is to interpret the law ; not to make the law.' সকলেই বুঝিলেন তিনি কেমন করিয়া Jus dicere হইতে Jus facere পৃথক রাখিতেন।

"দ্বারিবাবু সংস্কৃত জানিতেন না ; কিন্তু Hindu Law সম্বন্ধে যে কয়টি নজির রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম-দর্শিতা ও সারগ্রাহিতার পরিচায়ক। দায়ভাগসম্মত উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা Law of Inheritance and Succession তিনি যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমার বোধ হয়

যে, আমাদিগের কোনও অধ্যাপকের দ্বারা তাদৃশ অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইতে পারিত না। তাঁহার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগ করিতে পারিবে না, এই রকম কিছু করা যায় কি না। ফুলবেঞ্চে চৌদ্দজন জজের মধ্যে এই বিষয় মীমাংসিত হয়; দ্বারিবাবুর পক্ষে মাত্র দুইজন জজ—Justices Kemp and Glover—মত দিয়াছিলেন।

"পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিবাবু পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই; আত্মা, ভগবান, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোক-দেখানো কেনই বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাই?' কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তৎকালে যদি তাঁহার কোঁতের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিয়মে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কারণ, কোঁতের আর এক প্রধান কথা এই—To destroy, you must replace, অর্থাৎ যতক্ষণ সাবেকের বদলে নূতন কিছু জুটাইতে পারিতেছ না, ততক্ষণ সাবেক বজায় রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মত কোঁৎ নূতন ধর্ম্মপ্রচার-কালে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীগুলির প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ বা কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি অনেক বার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চাঁদাস্বরূপ টাকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'কেন দিব না? ক্যাথলিক ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের অনেক উপকার করিয়াছে, এখনও করিতেছে, আমি সেই জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা

করি।' তিনি তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন—Positivism regards all the past creeds as so many preparations for the demonstrated faith। কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা যায় না। তবে হিন্দু সমাজকে এরূপ ভাবে আঘাত করা কি উচিত?

"আর একটি কথা। শ্রাদ্ধের উৎসবের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান কোঁতের পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে; তফাতের মধ্যে এই যে, শুধু আমার পিতৃপুরুষের * শ্রাদ্ধের একটি দিন তাঁহাদের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত না করিয়া সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ হইতে যাবতীয় পূর্ব্বতন মৃত ব্যক্তিদিগের নামকীর্ত্তনস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিস্কার করিয়া কথাটা বলি। অন্ধসংস্কারবশতঃ মাসের নামকরণ দেবতাদের নামে করা হইয়াছে; তাই তিনি সমগ্র মানবসমাজের মধ্য হইতে তেরজন লোকের নামে তেরটি মাসের নাম করিয়াছেন; তাঁহার বৎসরে তেরমাস; যথা Moses, Homer, Aristotle, Archimedes, Cæsar, St.Paul, Charlemagne, Dante, Guttenburg, Descartes, Shakespeare, Frederick the Great, Bichat। প্রত্যেক মাসে ২৮ দিন; সেই দিনগুলির নামকরণও এক একজন মহাপুরুষের নামে হইয়াছে;—মনু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন্, কলম্বস্, বেকন ইত্যাদি।

* তবে গয়ার শ্রাদ্ধে সম্পর্কীয় ব্যতীত জ্ঞাত অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই নাম উল্লেখ করা হয় বটে।

এই হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া গেল। বাকি এক দিন যাহা রহিল, সেইটাই শ্রাদ্ধের দিন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, Feast of all the dead। চারি বৎসর অন্তর আর একটা শ্রাদ্ধের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে—Festival of Virtuous Women.

"কোঁৎ এই ব্যবস্থার নাম Positivist Calendar দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, এই পঞ্জিকাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতাবলম্বী এমন ব্যক্তিদিগের নাম একত্র সংযোজিত করা হইয়াছে, যাঁহারা জীবিতাবস্থায় পরস্পর একত্র দেখা হইলে গলা কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইতেন। ফলতঃ মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে বিশেষ গুণপনা ও অপক্ষপাতিতা ও সর্ব্বসংগ্রাহিতা (catholicity) প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোঁৎ যেমন একটি পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তিনি একটি লাইবেরি স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরের সুস্থতারক্ষার্থে আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহা-তাহা না খাইয়া বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য বাছিয়া লওয়া যেমন কর্ত্তব্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য তদনুরূপ একটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। যাহা তাহা পড়া অভ্যাস থাকিলে মস্তিষ্ক কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীন গ্রীক্, লাটিন, এবং আধুনিক ইংরাজী, ফরাসী স্পেনীয়, ইটালিয়, ও জর্ম্মান এই সপ্ত ভাষার মধ্য হইতে যত সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ আছে, তাহা বাছিয়া লইয়া Positive Library বলিয়া একটি পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন।

পুস্তকের সংখ্যা আন্দাজ আড়াই শত হইবে। সেগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—যথা, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং Synthesis। অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থগুলিও কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্য কথাটি ইংরাজি poetry শব্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কারণ ছন্দ ব্যতীত poetry হয় না, কিন্তু কাব্য বলিলে রঘুবংশও বুঝায় কাদম্বরীও বুঝায়। এই লাইব্রেরির কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে ইহা যে কতদূর সর্ব্বসংগ্রাহিতাসহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে,— Homer, Virgil, shakespeare, Dante, স্কটের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা, গোল্ডস্মিথের ভিকার, ফিল্ডিঙ্গের টম্ জোন্স্, বায়রণের বাছা বাছা কাব্য, পলবার্জিনিয়া, ইত্যাদি কি ছোট, কি বড়, বোধ হয় কোনও ভাল গ্রন্থ তিনি ভুলিয়া যান নাই। সেই লাইব্রেরি সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বারি বাবুর কতকটা চেষ্টা ছিল; কতক সংগ্রহও করিয়াছিলেন।

"এই লাইব্রেরি সম্বন্ধে মিল কিন্তু বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না, এই কথা তিনি Alexandriaর লাইব্রেরি দগ্ধ করার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা একপ্রকার sweeping holocaust of books. কিন্তু আমার বোধ হয় এস্থলে কোঁতের অভিপ্রায়ের মিল বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কোঁতের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, তিনি জানিতেন যে, সাধারণ লোকে বড় একটা বোঝে না কোন বহি পড়া ভাল আর কোন্ বহি পড়া

ভাল নহে, সেই জন্য যখন যাহা পায় তাহা পড়ে। সেই কুঅভ্যাস-বারণের নিমিত্ত যেরূপ পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক তাহারই একটি পরামর্শমাত্র তিনি দিয়া গিয়াছেন।

"কোঁৎ ভালরূপে পড়িবার নিমিত্ত শেষাশেষি দ্বারিবাবু ফরাসী ভাষা কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন পারিপাট্য জন্মিয়াছিল যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, ফরাসী ভাষায় লিখিত Positive Philosophy বহি খানি হাতে লইয়া তিনি এরূপ অনুবাদ করিয়া যাইতে পারিতেন যে লোকে মনে করিত যে তিনি একখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া যাইতেছেন; কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি কোঁৎ প্রণীত Analytical Geometry খানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"কোঁতের দর্শণশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া মিল একখানি পুস্তক লিখিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি কতকটা 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া দ্বারি বাবু একদিন বলিলেন, 'আপনি অত চঞ্চল হইবেন না। আমি মিলের বহি খুলিয়া প্রত্যেক ছত্র ধরিয়া দেখাইয়া দিব যে, তাঁহার গ্রন্থের ভিতর কতকটা আইনের চালাকির মত বদমায়েসি আছে।' কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না; ইহার পরেই তিনি জীবনান্তকারী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যে Cancer ব্যায়রাম হইয়াছিল, ইহা বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ

ডাক্তার মহাত্মা চন্দ্রকুমার দে—যিনি দ্বারিবাবুর খুড়শ্বশুর ছিলেন—তিনিই বুঝিতে পারেন। এই ডাক্তার একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারি বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি জর্ম্মান্ ভাষা হইতে ডাক্তারি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ফরাসী ভাষাও বেশ জানিতেন। ডাক্তারির পেশাদারি চালচলন তিনি বড় একটা জানিতেন না।

"Cancer এর কথা শুনিয়া দ্বারিবাবু একপ্রকার হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, কারণ অ্যালোপ্যাথি মতে Cancer সম্বন্ধে ডাক্তাররা একপ্রকার কবুল জবাব দিয়া বসিয়াছেন; তাঁহারা নিজেই বলেন যে, এ রোগের ঔষধ নাই। দ্বারিবাবুর চিকিৎসা নানা মতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে প্রণালী-সঙ্গত-রূপে হয় নাই। আমার মনে হয় যে হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজি ধারাবাহিকরূপে ক্রমাগত চালান হইলে, রোগমুক্ত না হউন, তিনি এতাবৎকাল এক প্রকার জীবিতাবস্থায় থাকিতে পারিতেন। উক্ত পীড়ায় তাঁহার মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ বক্রতা আসিয়াছিল; সেইটি উপলক্ষ করিয়া আমার একজন পরমাত্মীয় গোঁড়া ব্রাহ্ম বন্ধু সময়ে সময়ে একটা কথা বলিতেন যাহা আমি silly না বলিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিতেন, "দেখেছো, কৃষ্ণকমল, আমি এইটি লক্ষ্য করেছি যে, দ্বারিবাবু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি দৈব বিষয় সম্বন্ধে যে রকম মুখভঙ্গী করে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথাবার্ত্তা উচ্চারণ করেন, রোগে ওঁর ঠিক সেই বিকৃত মুখভঙ্গী করে দিয়েছে; এতে আমার মনে লাগে যে, সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর এই

শাস্তি দিয়েছেন।” তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক হইয়া যাইতাম; এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখনও নির্গত হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারিতাম না। ইহা আমি কেবল তাঁহার গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নাই।

“দ্বারিবাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আম্‌তার নিকটবর্ত্তী আগুন্‌সি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়ীতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ীর নিকটে গেলাম; আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

“প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারি বাবুর personality আমার চিত্রক্ষেত্রকে এরূপ প্রগাঢ়রূপে অধিকার করিয়া আছে যে, এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। কেবল আর একটি ব্যক্তি আমাকে বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার স্বপ্নে দেখা দিয়া থাকেন,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।”

৫

১৫ই পৌষ, ১৩১৭।

পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law lectures শুনিতে আসিতেন?" তিনি বলিলেন—"আমার Law lectures? বঙ্কিমবাবু?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ; আপনার।" তিনি বলিলেন—"না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?" আমি বলিলাম—"একজন প্রবীন সাহিত্য-সেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেক্‌চার শুনিতেন।" * তিনি বলিলেন—"দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law classএ লেক্‌চার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসাদ বাবু বঙ্কিম বাবুর সমসাময়িক লোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, গুরুদাস বাবু তখন

---

* প্রশ্নটি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ করা হইয়াছিল।

তথায় ওকালতি করেন ও কলেজে Law lecturer। তারাবাবু গুরুদাসবাবুর Law classএ উপস্থিত হইয়া লেকচার শুনিতেন। এ কথা আমি গুরুদাস বাবুর মুখে শুনিয়াছি।”

আমি বলিলাম—“আপনার বঙ্কিম বাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“ছিল বৈ কি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন হাবড়ায় কখনও কখনও আমার বাড়ীতে আসিতেন; যখন হাবড়ায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাবড়া হইতে এক গাড়িতেই আমরা দু'জনে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোঁৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি বলিলাম, ‘দেখুন, আমার মনে হয়, কোঁতের দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it.’ বঙ্কিম বাবু বলিলেন, ‘কেন? যেটা Truth তা'র আবার সময় অসময় কি?’ অবশ্যই বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।

“হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ বোধ হয় ইংরাজী ১৮৬০ সাল হইতে। আমার বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের বাড়ী খিদিরপুরে; হেমচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয়

সেই স্থানেই হইয়াছিল। যখন তিনি ৺রমাপ্রসাদ রায়ের ছেলে দু'টির শিক্ষকতা করেন, তখন বুঝিতে পারা যায় নাই যে তিনি একজন বড় দরের কবি হইতে পারিবেন। বালককাল হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু তখন ভবিষ্যতের সূচনা পাওয়া যায় নাই। তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিলেন; বৎসর খানেক মুন্সিফি করিলেন। সেই সময়ে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে টাকা দিয়া Norton's Law of Evidence বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া লয়েন। ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া দুটা একটা মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেম বাবুকেই argue করিতে হইল। তিনি মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সূত্রপাত হইল। বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে, কি কারণে তাঁহার কাব্য রচনার দিকে ঝোঁক গেল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভালরূপ আলাপ হওয়াতে—তিনি মেঘনাদবধের preface লিখিয়া দেন—তাঁহারও কাব্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

"কিন্তু হেমবাবুর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ইহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এটা তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘটনাটা কি? কবে ঘটিয়াছিল?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"আত্মহত্যা; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। আমার দাদার মৃত্যুর ঠিক মাস খানেকের ভিতর এই ঘটনাটি ঘটে; বোধ হয় তাঁহার দেখাদেখি। দাদার মত intellect সে সময় ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, তিনি বোধ হয় অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। অন্ধ হইয়া আজীবন পরাধীনতার কষ্ট হইতে মুক্তির বাসনায় তিনি বোধ হয় ঐ tragic ব্যাপারের সংঘটন করিয়া বসিলেন। গ্রীক দর্শন শাস্ত্র তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল; নিশ্চয়ই তিনি Epictetusএর কথায় নিজের পন্থা ঠিক করিয়া লইলেন। Epictetus বলিতেন—বাঁচিয়া থাকা যখন কষ্টকর, তখন মনে রাখিও যে, there is a door always open. রোমান বীরের ন্যায় বোধ হয় তিনি Epictetusএর কথা মানিয়া লইয়াছিলেন।

"আত্মহত্যাও সংক্রামক। দ্বিতীয় ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া হেমবাবু কবিতাটি লিখিলেন। আমিই প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের

"Man's love of man's life is a thing apart" (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবে

ও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।

"মাসিক পত্রিকায় হেমবাবুর ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইত। বোধ হয়, 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। 'বৃত্রসংহার' সুরু হইলে তাঁহার ওকালতিতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

"হেমবাবু অত্যন্ত sensitive ছিলেন। কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারি উকিল * অন্নদা বাবু অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেম বাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them; but I shall survive my poetry.' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। ড্রাইডেনের একটি কবিতা হেমবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন; আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ তৃতীয়ভাগে আছে।

* অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঐ যে Third Number Poetical Readerএ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সুকবি) বলেন, 'হেম বাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখ্‌তে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

"আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious। যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—Somehow or other it never came to the surface.

এইখানে আর একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের

উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল। হিতবাদীর সম্পাদকতা সম্বন্ধে কবি নবীন চন্দ্র সেনের একটি কথা আমার মনে আছে। তিনি হিতবাদী পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য আমাকে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে আমাকে "দেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। নবীন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন বটে; তাঁর তাৎকালিক কোনও এক কবিতা রচনা পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম এবং ভাবি উন্নতিরও কিছু কিছু পূর্ব্বসূচনা আমার মুখ হইতে বোধ হয় বাহির হইয়াছিল। নবীনের অবশ্য আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবার অধিকার আছে; কিন্তু তা বলিয়া আমাকে "দেব" সম্বোধন যেন আমার কিছু বাড়াবাড়ি বোধ হইয়াছিল। এই সম্বোধনটি পাইয়া আমার একটু হাসি পাইল; আমি বুঝিলাম যে নবীন বড় বড় কাব্যগ্রন্থ রচনা করাতে "দেব" এই সম্বোধনটা তাহার কলমে কিছু রপ্ত হইয়া গিয়াছে; সেই ঝোঁকে আমাকে সে ঐরূপ সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে।

"হেম বাবুকে আমি 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলাম; তিনি বলিলেন, 'আমার ভাল লাগে না।' কিন্তু এ বিষয়ে সারদাচরণ মিত্রের মতও ঠিক আমার অনুরূপ। আমি সারদাকে ভাল মন্দ পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই; এমন কথা তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমার কথায় তিনি সায় দিয়া গেলেন। দেখিলাম সারদা গ্রন্থখানিকে বিশেষরূপে admire করেন।

"যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দ বাবু হেম বাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্মেণ্ট জগদানন্দ বাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেম বাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন। কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কথাটার কোনও বনিয়াদ্ আছে।

"মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন,—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না; কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে,

তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature, যে revolutionএর চূড়ান্ত হইল Wordsworthএ। Edinburgh Review Wordworthকে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল,—'This will never do'. কিন্তু কবি অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।

"বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না। আমার দাদার বেকনও তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ বাঙ্গালা কথা ছিল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness. তাঁহার bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাস্পাকুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গ-হস্ত।

পরগুণপরমাণূন্ পর্ব্বতীকৃত্য নিতং
নিজহৃদিবিকশন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।

এই দুই ছত্রে 'ভামিনীবিলাসে'র কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরে সে উদারতা

কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজীশিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

"বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।

"কিন্তু আমিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সাধারণ্যে সমর্থন করি। এ কথা আমার জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি রিপণ কলেজে কায করি, একদিন আমার একটি পুরাতন ছাত্র—৺কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট—আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিদ্যাসাগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন ত আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতার চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।'

* * * *

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। তখন বেলা দুইটা। শীতকালে এই সময়ে তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হন। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া আমিও উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনার দাদার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি?"

তিনি বলিলেন—"না। তবে বহুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন মেট্‌কাফ হলে Moor's Life of Lord Byron পড়িতেছিলাম। তাহাতে বায়রণের যে চেহারা অঙ্কিত ছিল, তাহা অবিকল আমার দাদার। এমন আশ্চর্য্য similarity of features দেখা যায় না;—ললাট, নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠাধরের ভঙ্গি, কেশবিন্যাস, এমন কি বসিবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত, সমস্তই মিলিয়া গেল।"

৬

আজ প্রথমেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"রামেন্দ্র বাবুর 'হিন্দুস্থানে পৌত্তলিকতা' প্রবন্ধ পড়িয়াছি। লেখা আমার ভালই বোধ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু এ রকম ভাষা পছন্দ করিতেন না। গম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে 'লেনা দেনা' ও ঐ রকম চলিত কথা তিনি ক্ষমা করিতেন না।

"দেখ, ব্যাকরণ-দুষ্ট ভুল শব্দ ভাষার মধ্যে কেমন স্থান পায় সে বিষয় চিন্তা করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করা যায়। এই 'পৌত্তলিকতা, শব্দটাই দেখ না কেন। সংস্কৃত ভাষায় 'পুত্তলিকা' নাই, 'পুত্রিকা' আছে। প্রাকৃত 'পুত্তলিকা' সংস্কৃত ব্যাকরণের দৌলতে রূপান্তরিত হইয়া 'পৌত্তলিকতা' প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রবাবুর বহুপূর্ব্বে এই শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের 'পৌত্তলিক প্রবোধ' প্রবন্ধই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

"আমার মনে হয়, সংস্কৃত শব্দের মধ্যে phonetic decayর চিহ্ন যেন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। একটা শব্দ দেখ না,—'কালিন্দী'। আমার যতদূর স্মরণ হয়, যমুনার একটি নাম 'কালিন্দী' অমর-কোষেও আছে। আমি অনুমান করি যে, ঐ শব্দটি 'কালী নদী' এই দুইটি শব্দের একীকরণে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যমুনার কালো জল দেখিয়া উহাকে কালী নদী বলা বিচিত্র নহে।

এই কালী নদী কালক্রমে phonetic decayর দরুণ কালিন্দী রূপ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে লোকে ভুলিয়া গেল যে, কালিন্দী কালী নদীর অপভ্রংশমাত্র। শব্দটির জন্মকথা নূতন করিয়া কল্পিত হইল; গঙ্গার ন্যায় তাহাকে গিরিসুতা কল্পনা করাই সঙ্গত বোধ হইল। কালিন্দী দাঁড়াইল 'কলিন্দ-গিরিনন্দিনী।' আবার দেখ, বাঙ্গালা 'অপরূপ' সংস্কৃত 'অপূর্ব্ব' হইতে প্রাকৃত 'অপূরবের'র (বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে দেখিতে পাইবে) ভিতর দিয়া পাওয়া গিয়াছে।

আবার অনেক সময়ে ছাপার ভুল চিরস্থায়ী হইয়া যায়। সাহিত্যদর্পণকার এই কবিতাটি তুলিয়াছেন,—

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামং।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন 'যথা কুন্দমালায়াং', অর্থাৎ কবিতাটি 'কুন্দমালা' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু হেবার্লিন (Hœberlin) কর্ত্তৃক সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ পুস্তকের (Sanskrit anthology) মধ্যে মুকুন্দমালা নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক মুদ্রিত আছে। হঠাৎ একদিন আমি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুকুন্দমালার মধ্যে সাহিত্যদর্পণের ঐ শ্লোকটি দেখিলাম। তাহাতে বুঝিলাম 'কুন্দমালা' কথাটি ছাপার ভুল। সাহিত্যদর্পণকার 'মুকুন্দমালা' নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে এই ছাপার ভুলটি

বদ্ধমূল হইয়া আছে। অদ্যাপি কেহ ইহা জানেনও না, সংশোধনও করেন নাই।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার এক কন্যার নাম 'কুন্দমালা' রাখিয়াছিলেন। এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে তিনিও সাহিত্যদর্পণের ছাপার ভুল হইতে কন্যার নামের আভাস পাইয়াছিলেন। তবে কুন্দমালা নামটি ও অর্থশূন্য নহে; এমনও হইতে পারে যে তর্কালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ হইতে আভাস না পাইয়াও নিজের পছন্দমত মেয়ের নাম দিয়াছিলেন।

শুধু নামের গোলমাল নহে, সংস্কৃত মুদ্রিত পুস্তকে প্রেক্ষাবান সংস্কর্ত্তার (editor of a critical acumen) অভাব নাই। প্রাকৃতের শ্লোক পর্য্যন্ত গদ্যের আকারে ছাপা হইয়া আসিতেছে। মুদ্রারাক্ষসে চন্দনদাস যখন প্রথম দেখা দিলেন, তখন তিনি যাহা মনে মনে কহিতেছেন তাঁহার প্রথম অংশটি নিশ্চয়ই প্রাকৃত আর্য্যা; কিন্তু বরাবর গদ্যের আকারে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; যথা,—

চাণক্কম্মি অঅরুণে
সহসা সদ্দাবিদস্স লোঅস্স।
ণি দ্দোসস্স বি সঙ্কা
কিং উণ মম জাদ দোসস্স॥

"পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন্

সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলে মানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড় লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। কখনও কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কি না, মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন।

মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন; তাঁহার কথায়, কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন,—'আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, একথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।' সাহিত্যের দিক্ দিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান patron ছিলেন। তাঁহাদের রাজবাটীতে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়।

"বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন।

মহাভারত অনুবাদক পণ্ডিতদিগের সভা।

'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিসের মূল্য হয় না।

"আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইত যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্ব্বে আমি যে তাঁহার literary jealousyর কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। 'সাহেব দের' নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে 'সাহেব' সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

"কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও। Mrs. Besant হিঁদুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল; প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা অপরিহার্য্য প্রসব।

"যৌবনেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয়; বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কতকটা নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার খেয়ালের অন্ত ছিল না। বোধ হয়, তিনি purse-proud ভাব কতকটা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার purse এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না। যেদিন Revd. Mr. Long এর মোকদ্দমার রায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সে দিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন; হাজার টাকার জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা অদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

"মহাভারত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের শব্দকল্পদ্রুমের পার্শ্বে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher, nobler sympathies যথেষ্ট ছিল; লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।

"তাঁহার 'হুতোম প্যাচার নক্সা'য় অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনা সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt

হইয়াছিল। বোধ হয়, ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। একটা প্রবন্ধের মধ্যে 'Xenophon থেকে ভাঙ্গা' এই শব্দযোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর হাসিতেন। 'মাসিক পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারী-চাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলালে' সেই tendencyর চূড়ান্ত করিয়া যান। তাহার পরে যখন এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হইল, বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকার ধারণ করিল, নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাষায় সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন।

"হুতোম প্যাচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীন বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া-ছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; নক্সায় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে ' Arry বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইক্তার হইয়া নানা প্রকার বাদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্সায় সেই প্রকৃতির

লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

"Satire হিসাবে হুতোম প্যাচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten; এবং রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্তের ও 'গুড় গুড়ে ভট্‌চার্য্যির' লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। 'প্রভাকরে'র সম্পাদক এবং 'ভাস্করে'র সম্পাদক নিভাঁজ খেউড় গাহিতেন; ধাপার মাঠে ছাড়া আর কুত্রাপি ঐ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ওরফে গুড় গুড়ে ভট্‌চার্যি যে 'রসরাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপাঠ্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীর আসরে, বিলাসী লোকের বৈঠকখানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। বিকৃতরুচি সমাজের মধ্যে এই সকল রচনা উপভোগ্য হইয়াছিল।

"বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি এই একটানা কুরুচির স্রোতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারেন? নব্যদলের মধ্যে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন বনিয়াদি বড় লোকের আসরে তিনি কি করিতে পারেন? তথায় সুরুচির দোহাই দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইত।

"কিন্তু unconsciously সাহিত্যে উৎকট কুরুচি হইতে সুরুচির দিকে যে transition আরব্ধ হইয়াছিল, বিদ্যাসাগর তাহাতে কতকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। সচেষ্ট ভাবে একটা

reform movement যে করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। এই transitionএর ইতিহাস চাহ? ঠিক ইতিহাস দিতে পারিব না, তবে কয়েকটি কথা বলিতে পারি।

"বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন; সমাজের কুরুচি ব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জ্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। অত কথায় কায কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়ীতে ডাকাইয়া বলিতেন 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'; ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত,—

"বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের * * * * * দিয়েছে।"

গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সে সময়ে সমাজের বায়ু কিরূপ দূষিত ছিল। কোঁৎ যে intellectual sanitationএর কথা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সে দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না।

"কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময় যে নব্য-যুবক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা সবল ও পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল। কেশব সেন যখন আসিলেন, তখন transition হইয়া গিয়াছে।

"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্মেণ্ট যখন আরব্ধ হইল, তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকিল। সভায়, debating clubএ, বৈঠকখানার আসরে রাজনীতির চর্চ্চা হইতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন Presidency Collegeএ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের একটা debating club ছিল। তখন আমাদের কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণী ৺রামকমল সেনের বাড়ীর (এখনকার এল্‌বার্ট্ কলেজের) এক অংশে বসিত। ক্লাবের সম্মিলনও সেই স্থানে হইত। সেই ক্লাবে কেশব সেনের বক্তৃতা আমি প্রথম শ্রবণ করি। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল Heroism of the ancient Hindus; ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র লইয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছিল। কেশব বাবু আধঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি 'exonerate' কথাটি চার বার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার বোল্ ফোটে নাই। কিন্তু যুবকগণ তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতায় চমৎকৃত হইয়াছিল। সকলের মনে seriousness ও religious fervour জাগাইয়া তুলিয়া তিনি যে সাহিত্যে ও সমাজে সুরুচির পথ সুগম করিয়া

দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেশব বাবু ক্রমশঃ দেশে বিদেশে খ্রীষ্টান্ অখ্রীষ্টান্ সকলের নিকট আদর পাইলেন। খ্রীষ্টান্ তাঁহার eclecticismএর আবরণ ভেদ করিতে প্রথম প্রথম পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কেশব সেন শীঘ্রই খ্রীষ্টান হইবেন; এমন কি, Lord Lawrenceএর মনেও এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছিল 'সোমপ্রকাশ'। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক সোমপ্রকাশ পত্রে হইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই প্রথমে দেখাইলেন যে, বাঙ্গালায় সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর কাগজ হইতে পারে। সাহিত্যে ও সমাজে সোমপ্রকাশ যুগান্তর আনয়ন করিল। কুরুচি ও অশ্লীলতা আর কতদিন টিকিতে পারে? হিন্দু কলেজের এক শিক্ষকের সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যখন ছেলেদের জলপান করিবার ছুটি হইত, সেই সময়ে সেই শিক্ষকটি সংস্কৃত কলেজে আসিতেন এবং তাঁহাকে ইংরাজি শিখাইতেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এইরূপ বিদ্যাভ্যাস হইত। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে, Schmitz রচিত রোমের ইতিহাস তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন।

৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথাপ্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে পড়িতেছে। তিনি একবার একজন phrenologistকে আমার মস্তক পরীক্ষা করিতে বলেন। আমি তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ক্লাশে অধ্যায়ন করি। Phrenologistএর নাম

কালীকুমার দাস। কালী বাবু সুপণ্ডিত ছিলেন। Dr. Duffএর সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া দুই শত পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড duodecimo পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ফেলেন। তিনি কি কাজ করিতেন ঠিক আমার স্মরণ নাই। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল, কালীবাবু কায-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, 'খবরের কাগজ পড়িতে হইবে, কাজ না ছাড়িলে সময় হইবে না।' ভদ্রলোক আমার মাথা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আমার রাগ এত ভয়ানক যে আমি মানুষ খুন করিতে পারি। কথাটা নেহাৎ অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বরাবর আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সামলাইয়া চলিতে হইয়াছে।

"সমাজে ও সাহিত্যে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। নূতন দল পুরাতনের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল; পুরাতন নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সমাজকে ও সাহিত্যকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। এই ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও সাহিত্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের গোলমাল চুকিয়া গেল, কিন্তু কৌলিন্যপ্রথার উপর আক্রমণ আরব্ধ হইল।

"তখন আমার প্রথম যৌবন; ১৪।১৫ বৎসরমাত্র বয়স। শিবতলায় বসাকদিগের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনীত হইল। আমি সেই অভিনয় দেখিতে গেলাম। কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে, শিক্ষিত বঙ্গসমাজ কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। The play came out as a surprise upon the Bengali-reading public; বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল

comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে। রচয়িতা পণ্ডিত রামায়ণ বিত্থারত্ন, আমার শিক্ষক ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিত্থারত্ন মহাশয়ের 'রত্নাবলী' শিক্ষিত বঙ্গসমাজের আদরের বস্তু। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এইঃ—

অতিরক্তবপুঃ স্খলদ্গতি
র্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী-
বহুসেবাফলমেতদেব হি॥

এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।

প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে, মন্দগতি হ'য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্চে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে ঝাঁপ দিচ্চেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল।

দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ'য়ে উঠেছে, সে চল্‌তে গিয়ে হোঁচট্ খাচ্চে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খ'সে পড়্‌ছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

"এই মদ্যপান-প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্যারিচরণ সরকারের নাম

স্মরণ করা উচিত। একটি Temperance movement গঠিত করিয়া তিনি অনেক দিন তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। চারিদিকে মদ্যপানের বিরুদ্ধে crusade চলিতে লাগিল। তাঁহার এই Temperance movement শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান-নিবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাতালদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। আমি কয়েক জনের কথা জানি, যাহারা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল; কিন্তু একটা কথা প্রচারিত হইল, তিনি গঞ্জিকা সেবন করেন! আমার মনে হয় it was a calumny propagated by drunkards ধীরাজ কিন্তু গান ধরিল—

মধুপান আর কোরো না,
Young Bengal বাঁচবে না,—

* * *

কিন্তু ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা।

ঐ "ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা" চরণটি গাহিবার সময় ধীরাজ হেলিয়া দুলিয়া pantomime এর মত স্বহস্তে গঞ্জিকামর্দ্দনের অনুকরণ করিয়া, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। ধীরাজ মদ খাইত।

৭

৩রা বৈশাখ, ১৩১৮।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"সম্প্রতি একটি হিন্দু মহিলা * 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক একখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমি যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রচনা একটি অল্প-বয়স্কা বঙ্গমহিলার। ইহাতে যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের। আত্মানন্দ, ত্রিতত্ত্ব, সচ্চিদানন্দ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইত্যাদি দুরবগাহ বিষয় লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া যায়, বুদ্ধি পক্ষাঘাতপ্রাপ্তবৎ হইয়া উঠে, সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, লেখিকা বিশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, যদি চ অর্দ্ধশতাব্দী কাল হইল এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এক প্রকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকরা গল্পের বহি বা নাটক অথবা বড় জোর দু'দশখানি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা-চর্চ্চা ইহার উপর বড় বেশী উঠে না। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার সেই ভ্রম অপ-

* শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী।

সারিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহারাজচক্রবর্ত্তী দার্শনিক-গণ যে সকল বিষয়ের অনুশীলন করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, রচয়িত্রী সেই সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমি এ সকল বিষয়ের আন্দোলনে নিতান্ত অপটু, একেবারেই অক্ষম, এবং ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র—"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"সে কি মহাশয়? আপনার এ কথা শুনিয়া লোকে মাথা নাড়িবে; বলিবে, স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া আপনি সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন।"

তিনি বলিলেন—"না। আমাকে ভুল বুঝিও না; আমি যে বেদান্তে পারদর্শী এ ধারণা লোকের হইতে পারে না।"

আমি বলিলাম—"অবশ্যই আমাদের সকলেরই পক্ষে ইহা একটি বিস্ময়ের বিষয় যে আপনি সংস্কৃতশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হইয়া আপনার spiritual consolation পাশ্চাত্য positivismএ কেমন করিয়া পাইলেন। না হয়, আপনি এই পুস্তিকাখানি উপলক্ষ করিয়া ধ্রুবদর্শনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বলিয়া যাউন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"সেটা উচিত নহে। আর আমার পাণ্ডিত্যের কথা যখন তুমি তুলিলে, তখন কয়েকটি কথা আজ বলিব; প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি একটা বিষয়ে

আপনাকে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। আমার যে সকল গুণ অথবা বিদ্যাবুদ্ধিসংক্রান্ত যোগ্যতা অথবা বিশেষ পারদর্শিতা নাই, অনেক সময়ে আমি লোকের নিকট সেই সকল বিষয়ে প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক প্রকার আমার যশোভাগ্য বলিতে হইবে। আমার একটি বন্ধু ছিলেন, ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র। লোকটি খুব "মস্করা" ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সময়টা কাটান যাইত, বড়ই হাসি খুসিতে কাটিত। তিনি একদিন আমাকে আধ্ তামাসার ছলে বলিলেন, 'আরে কৃষ্ণকমল, জান কি বলত? কেবল ভোগা দিয়ে খাও বৈ ত নয়।" কথাটা বেশ আমার মিষ্ট লাগিল; এবং কতকটা মনে বদ্ধমূল হইল। ভাবিলাম, বলেছে মন্দ নহে। সেই হরিশ্চন্দ্র আবার আর একদিন আর একটা ব্যাপার দেখিয়া কিছু তাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। 'পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন "শব্দস্তোম মহানিধি' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত অভিধানখানি—ইহা বাচস্পত্য অপেক্ষা অনেক ছোট—মুদ্রিত করিতেছিলেন, তখন আমাকে একটা করিয়া প্রুফ দেখিতে বলিতেন। আমিও দেখিয়া দিতাম; এবং যদিও তাঁহার লেখার উপর আমার কলম চালান এক প্রকার ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি সময়ে সময়ে আমি একটু বদল করিয়া দিতাম। সে সমস্ত এই ভাবের পরিবর্ত্তন যে, তিনি হয় ত বড় কঠিন সংস্কৃত লিখিয়াছেন, আমি একটু সহজ করিয়া দিলাম। তিনি হয় ত লিখিয়াছেন, 'কোকিলস্য পরপুষ্টত্বাৎ, আমি হয় ত করিয়া দিলাম 'কোকিলো হি পরপুষ্টঃ'। তিনিও

বুঝিতেন যে, ছেলেদের জন্য অভিধান হইতেছে, যত সহজ হয় ততই ভাল; অতএব তিনি আমার এ প্রকার পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য করিয়া লইতেন। একদিন হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত। এই ব্যাপার দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'অ্যাঁ! তুমি কাটিয়া দিয়াছ; আর তারানাথ তাহা মঞ্জুর পর্য্যন্ত করিয়াছেন! তাই ত, তুমি বড় কম লোক নও।' এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিতে পারি। কায়স্থদিগের একটা চিরস্থায়ী গ্লানি তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার অভিধানে 'কায়স্থ' এই শব্দ উপলক্ষ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের একটা উদ্ভট অনুষ্টুভ্ শ্লোক কায়স্থজাতির লোভ ও অর্থকার্পণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার অভিধানে এই শ্লোকটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া উঠাইয়া দিতে কহিলাম। প্রথমে তিনি রাজি হইলেন না, পরে অনেক করিয়া বলাতে শেষ কালে রাজি হইলেন। আমার বোধ হয়, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের ভক্ত ছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত শ্যাম বিশ্বাসের কিছু তীব্র ভাবে সেই উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, এবং কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়া রাগ সমলাইতে পারেন নাই। এটি কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনুমানমাত্র।

"যাহা হউক, হরিশ আমাকে যে ভোগা দিয়া থাইবার দোষা-

রোপ করিয়াছিল সে কথাটি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে, এবং আমি আপনা আপনি হাসি। আমি মনে মনে বেশ জানি যে, সাধারণতঃ লোকে আমাকে সংস্কৃতশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত মনে করে, আমি তাহার কিছুই নহি। ফলতঃ আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমার সংস্কৃতজ্ঞান কতকটা পল্লবগ্রাহিতা যাহাকে বলে তদ্রূপমাত্র। সুগভীর পাণ্ডিত্য কোনও বিষয়েই আমার নাই, এটি আমার আন্তরিক অমায়িক বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের বিষয় আমি আমার পূর্ব্বতন ছাত্র অবিনাশ চন্দ্র ঘোষের নিকট বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। অবিনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ; এখন গভর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গলি' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র সংস্থাপিত করিয়া যান, এবং আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কথা বলায় অবিনাশ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং আমার মুখের উপরে বলিলেন—'এটা কি হচ্চে? এটা কি affectation নাকি?' আমি থামিয়া গেলাম। আমি জানি যে, অবিনাশ আমার খুব ভক্ত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। আমি কোন্ কালে সংস্কৃত কোন কোন পাঠ্য গ্রন্থ অধ্যাপনার সময় উহার কি ইংরাজি অনুবাদ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতাম, এখনও পর্য্যন্ত অবিনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার তারিফ করিতে ছাড়েন না। অবিনাশের মত সুবিদ্বান ব্যক্তির মুখে ঐ সকল প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমিও মনে মনে খুসী হই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমার নিজের সংস্কৃতজ্ঞতা

বিষয়ে আমার নিজের যাহা মত আছে, আমি জানি যে সেইটাই ঠিক।

"অধিক দিন নহে, আমি ও মহেশ ন্যায়রত্ন ও নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, আমরা তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রবেশিকা গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলাম। জানি না, কি গতিকে by some irony of fate, তাহাতে এত ভুল বাহির হইয়াছিল, যে আমাদের তিন জনকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রওয়ালারা দিন কতক খুব আমোদ করিয়াছিল। একজন লিখিয়াছিল—'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম্'; আর একজন আমার নাম করিয়া লিখিয়াছিল—'নামে তাল পুকুর ঘটি ডোবে না'। যাহা হউক, প্রবেশিকার সেই সংস্করণে যতদূর মূর্খতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ততদূর মূর্খ নহি বটে; কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা বলিতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমলের প্রকৃতপক্ষে ছিল। আমার তাহা কিছুই নাই। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে ১০।১১ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই কয় বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রের এমন কোনও অংশই নাই যাহা তিনি প্রগাঢ়রূপে এবং সুগভীর আলোচনার সহিত অনুশীলন করেন নাই,—কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন যখন যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাতেই এরূপ পারিপাট্য ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধ্যাপকগণ উত্তরকালের ছাত্রদিগের নিকট তাঁহাকে দৃষ্টান্তের স্বরূপ উপন্যাসিত করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের

শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ করি, তখন আমাদের পাঠশৈথিল্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতেন, 'যথার্থ শিখিবার উদ্যম কেবল রামকমলের দেখিয়াছি।'

"যাঁহারা নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আমার বিষয়ে ভাবেন যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের কোনও অঙ্গই আমার অবিদিত নাই; দর্শন, স্মৃতি, সকল বিষয়েই যেন আমার মতামত দিবার ক্ষমতা আছে। আমি অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি; কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় ওরূপ করিতে গেলে লোকে বিপরীত বুঝিবে, আমাকে অহঙ্কারী বিবেচনা করিবে।

"আমার এই প্রকার যশোভাগ্যের যে কারণ কি তাহাও আমি এক প্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এণ্ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার একট নাম বাহির হইয়াছিল, এবং আমি উপযাচক না হইয়াও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকের একটা অভ্যাস এই যে, যিনি গভর্মেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি দেশের লোকের নিকটও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন; এই কথা ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি অল্প বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র প্রফেসর হওয়াতে সাধারণে ভাবিলেন যে, আমি না জানি কত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

"তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন কতকটা ভিতরের ব্যাপার

বুঝিয়া রাখিয়া ছিলেন, কারণ তিনি একদিন আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, 'তোরা দুইয়ের বার হয়ে রইলি; না ইংরাজিও তেমন লিখতে পারিস, না সংস্কৃততেও পণ্ডিত হলি।' তিনি তখন 'বিধবা বিবাহ' বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে তাঁহার যুক্তিবিন্যাসগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

"প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা অনেক বলিলাম, বোধ হয় এখন সংস্কৃতজ্ঞান সম্বন্ধে আর আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একটু মোড় ফিরাইয়া লওয়া যাউক,—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা একটু আলোচনা করিলে ক্ষতি কি?

"বোধ হয় তোমরা জান না যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাঙ্গালায় 'বাক্যমঞ্জরী' নাম্নী একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। It is an excellent work on syntax,—আমার মনে হয় সে ধরণের পুস্তক আমাদের আর নাই। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ও বাঙ্গালা লিখিতেন; ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' নাকি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রভাকরের motto দু দফা তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দফা:—

সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দফা :—

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিৎ
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীযদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্ বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে.
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফা রসং॥

আবার তিনি 'ভাস্করে'র motto'ও লিখিয়া দিয়াছিলেন।—

ভ্রাতর্বোধসরোজ কিং চিরয়সে। মৌনস্থ নায়ং ক্ষণঃ।
দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতং।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎ কৃত্যমত্যাদরাৎ,
গৌরীশঙ্কর পূর্ব্ব পর্ব্বতমুখাৎ উজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

"ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' দৈনিক পত্র; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি প্রতি মাসে একখানি মাসিক সংস্করণ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে বিবিধ গদ্য থাকিত এবং যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কবির গান ইত্যাদি রচনা করিবার শক্তি তাঁহার সামান্য ছিল না। তাঁহার সময়ে 'কবির লড়াই' বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনদার বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি নিজে কোথাও গান বড় একটা গাহিতেন না, তাঁহার গলাটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা গোছ ছিল। কিন্তু সেকালে তাঁহার গান বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। একটি গান তোমাকে বলিতেছি, এই গানটি এখনও আমার দেহে পুলক সঞ্চার করাইয়া দেয়, জানি না এ গানটি মুদ্রিত হইয়াছে কি না। গানটি এই :—

পুরবাসী বলে, রাণী, তোর তারাহারা এলো ঐ।
অমনি পাগলিনী প্রায়, এলোকেশে ধায়,
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে, আমার উমা কি এলে,
একবার আয়, মা, আয় গো করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বোলে আনতে গিয়েছিলি,
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে, মা, মায়া কি পাসরিলি,
কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই,
অমনি সরমে মরে যাই।
আমি বলি আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।
তুমি গেলে না কো নিতে, জেনে এলেম আপনা হ'তে,
র'ব না কো যাব দু দিন গেলে।

গানটি বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ নাই, কিন্তু ইহার রচনার লালিত্য ও চমৎকারিতা চিন্তা করিয়া মোহিত হইতে হয়। আজিকার কালে এরূপ রচনা কাহারও লেখনী হইতে বাহির হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মেকলে অ্যাডিসনের চমৎকার গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,অ্যাডিসনের রচনা দ্বিতীয় চার্ল-সের আমলের আধা-ফরাসি রচনা হইতে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন,তেমনই এখনকার আধা-জর্ম্মান রীতি হইতেও স্বতন্ত্র। যথার্থ ইংরাজি

রীতি যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে অ্যাডিসনের গদ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গানটির বিষয়েও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। উহাতে বামুন পণ্ডিতি সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি নাই, এবং এখনকার ইংরাজিতর্জ্জমা বাঙ্গালার ভঙ্গিও নাই। ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু পাঁচ জন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একজন দাশুরায়, একজন ভারতচন্দ্র, আর এ কালের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত।

"উত্তরকালের অনেকগুলি লেখকের ওস্তাদ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। বঙ্কিম বাবু আপনাকে তাঁহার একজন সাকৃরেদ্ বলিয়া জানিতেন, এবং অক্ষয় দত্তের বাঙ্গালা রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরুর রচনাপদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্যা-সাগরেরও মাছিমারা গোছের নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন, ইহা কোনও মতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনার ঔদার্য্য ওজস্বিতা, অকপট আন্তরিকতা এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লেখকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত 'বাহ্যবস্তুর' প্রথম ভাগের শেষে আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধকল্পে এক সতেজ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশে সুরাপানের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজি লেখক অ্যাডিসনের মত মদিরার বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; উভয়েরই পেটে একটু পড়িলে মাথাটা খুলিত ভাল। এই কারণেই বোধ হয় ঈশ্বর গুপ্ত সুরাপান সম্বন্ধে শিষ্য অক্ষয় কুমারের কটাক্ষপাত দর্শন করিয়া কিছু দিন পরে বিলক্ষণ 'দাদ তুলিবার' অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত এই—

'বাহ্যবস্তুর' রচনার কয়েক বৎসর পরে অক্ষয় কুমারের মস্তিষ্ক বোধ হয় অতিরিক্ত চালনা-দোষে এত নিস্তেজ ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার লেখা পড়ার ব্যাপার ত্যাগ করিয়া বালিগ্রামে যাইয়া একটি নিভৃত স্থানে গাছপালা রোপনে অন্যমনস্ক হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ক্ষেপন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় শুনিতে পাই তিনি মাংসও ধরিয়াছিলেন, Port wine ও ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষাবস্থা উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাসগর্ভ একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ছত্রটি ছিল:—

'মাথামুণ্ড ঘুরে গেল মাথামুণ্ড লিখে।'

"বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন যে তাহা হয় না, কেন যে তাঁহার স্মরণার্থ একখানি ছবি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও উদ্যোগ কখনও প্রকাশ্যরূপে হয় নাই, ইহা শুদ্ধ যে অনাকলনীয়

(inconceivable, unaccountable) তাহা নহে, ইহাতে বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাবৃত্তি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রকলেবর তাহাও প্রকাশ পায়। সে বিষয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিতে গেলে অধিক দূর যাইতে হয় না, লর্ড রিপণের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। রিপণের স্মৃতিরক্ষাবিষয়ে আমরা যে ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া বসিয়া আছি, তাহাতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তাপ্রবণতা থাকিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর অধোবদন হইয়া থাকা উচিত। ঈশ্বরগুপ্ত আর লর্ড রিপণ এই দুইজনের নাম এক প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। একজন যেমন রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যুদারমতি ছিলেন, আর একজন তেমনই একটি অল্পবয়স্ক সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আপনার জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্মেণ্টের নিকট বড় একটা জানিত ছিলেন না। আর আমরা বাঙ্গালী যতই আস্ফালন করি না কেন, গভর্মেণ্ট আঙ্গুল না বাড়াইলে আমরা কে ভাল কে মন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

"প্রকৃত বাঙ্গালাভাষায় রীতি-বিশুদ্ধ (idiomatic) রচনা-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাশুরায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়। দাশুরায়ের রচিত একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাটে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু' এক পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জ্জমাকরা

আধা ইংরাজি লেখা যাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাঁহাদের সর্ব্বদা সেই ১০।১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে। গানটি এই ঃ—

কি আনন্দের কথা, উমে, ও মা লোকমুখে শুনি,
সত্য বল শিবানি, অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে।
অপর্ণা যখন তোরে অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিকের ভিখারী,
আজ কি আনন্দের কথা বল্‌লি, শুভঙ্করি,
বিশ্বেশ্বরী না কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
খ্যাপা, খ্যাপা সবে বল্‌ত দিগম্বরে,
গঞ্জনা পেয়েছি কত ঘরে পরে,
আজ দ্বারি নাকি আছে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে,
দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে,
কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে,
ফলেছে কি ফল তোমার কপালক্রমে।
বিষয় বৃদ্ধি বটে বিশ্বাস হয় যে মনে,
তা না হলে গৌরীর এত গৌরব কেনে,
চেয়ে দেখ না আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকাও কেন দাশরথি নামে।

এমন সরল ভক্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন? বহুদিন ধরিয়া আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছি, সমস্ত

বিষয়েই পশ্চিম হইতে inspiration লইয়া আপনাদিগকে সার্থক মনে করিয়াছি। আপনাদের শব্দসম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশী কথার তর্জ্জমা করিয়া বিদেশী সুরে গান গাহিয়াছি, নহিলে ভিত্তিহীন, বিশেষত্ব, সহানুভূতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইল কেন? এই গুলির কি খাঁটি দেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই? আমাদের এই নবজাগ্রত স্বদেশভক্তি যদি বাস্তবিকই আমাদের দেশের দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্ত দাশুরায়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না।

শুনিয়াছি ম্যাক্স মুলার যখন ঋগ্বেদের মুদ্রাঙ্কন সংস্করণরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তখন পাণিনির প্রায় চারি হাজার সূত্র সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখিবার জন্য, সূত্রগুলি আগাগোড়া ঘরের দেওয়ালে এমন করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, যখনই যে সূত্রের আবশ্যক হয় তখনই তাহা দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে হয়, আমাদের সাহিত্যের পর্ণকুটীর হইতে বৈদেশিক 'ভিত্তিহীন' প্রভৃতি শব্দ বহিষ্কৃত করিয়া খাঁটি দেশী কথায় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে হয় ত প্রথম প্রথম কুটীরগাত্রে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। হয় ত তখন আবার ঈশ্বর গুপ্ত দাশুরায়ের মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক খাঁটি বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে।

"ইংরাজি-ভাঙ্গা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হইল তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে

ইংরাজি ভাষা কিম্বা তাদৃশ সম্পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত অন্য কোন য়ুরোপীয় ভাষা হইতে শব্দ, ভাব ও "ধর্‌তা" ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য লইতে হইবে না, বা অনুকরণ করিতে হইবে না। ইহাতে ভাষা দোঁয়াশলা হইয়া আসে বটে কিন্তু ভাষা দোঁয়াশলা হইলে যে তাহার পূর্ণতা-প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ব্যাঘাত ঘটে এ প্রকার বোধ হয় না। ইংরাজির মত দোঁয়াশলা ভাষা আর নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার (ডি ফো) কোনও স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—'আমরা ইংরাজ জাতি বর্ণসঙ্কর-বিষয়ে নাক তুলি কেন? আমাদের মত সঙ্কর জাতি—mongrel race—আর কোথায় আছে? দিনেমার, জার্ম্মান, কেণ্ট, টিউটন প্রভৃতি কত জাতির রক্ত আমাদের শিরায় বহিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা ভার।" ডি ফো ইংরেজ জাতির বিষয়ে যে সঙ্করের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষাতেও সেরূপ দোষ—দোষই বল আর গুণই বল—আরোপ করা যাইতে পারে। তথাপি কিন্তু ইংরাজি অপেক্ষা সমধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কোন ভাষা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে?

মেকলে আপনার ইতিহাসের একস্থলে সাহঙ্কারে বলিয়াছেন,—আর সে অহঙ্কার অমূলক নহে,—যে কবির কার্য্যই বল, গদ্য লেখকের কার্য্যই বল, বক্তৃতার ব্যাপার বল, পরিহাসরসিকতা ইতিহাস রচনা ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে ভাষার উপযোগিতা আছে, তাহার কোনটিতেই পূর্ণতা লাভ করিতে ইংরাজী ভাষা অক্ষম বা অনুপযুক্ত নহে, এবং পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার নিকট এ সম্বন্ধে ইংরাজিকে হীনতাস্বীকার করিতে হইবে না; তবে যদি

হয়, বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক ভাষার নিকট চাই কি হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে 'আঁশ'—hybridism, mongrel character—বেশী সংখ্যায় থাকিলে যে ভাষাকে হীন থাকিতে হয়, একথা ঠিক নহে। তবে আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভ সম্বন্ধে একটা ব্যাঘাত রহিয়াছে,—সেটা আমাদের রাজ-নৈতিক অবস্থা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, বহুকাল পরাধীন কোনও জাতির ভাষা কস্মিনকালে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। এসিয়া মাইনর সেইরূপ একটি দেশ; ইহার কোনও ভাষা কখনও গা তুলিতে পারে নাই। ইটালির ভাষাকে এ বিষয়ের বিরুদ্ধ প্রমাণ বলা যায় না; কারণ, ইটালির মধ্যে কেবল সিসিলি ও নেপল্‌স অনেক দিন স্পেনের অধীন ছিল, এবং উত্তরে লম্বার্ডি কিছুকাল অষ্ট্রীয়ার অধীন থাকে। কিন্তু অন্যান্য অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সে সকল রাষ্ট্রে স্বদেশীয় লোকেরই প্রাধান্য। তাঁহাদের অনেকেই অত্যাচারী ও উৎপীড়ক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইটালির লোক। অতএব ডান্টে, টাসো, আরিয়ষ্টো, পেট্রার্ক ইঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখা-ইয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, এরূপ অবস্থা ভাষা বিকা-শের গুরুতর বিঘ্ন নহে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে,—প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও আধুনিক রোমেক (Romaic) ভাষা। কই, রোমেক ভাষাতে কে কোথায় বড় গ্রন্থকার জন্মিয়াছে? যে অবধি গ্রীসের স্বাধীনতা গেল, সেই অবধি তাহার সাহিত্যও

গিয়াছে। অতএব আমার ত বোধ হয়, উন্নতি সম্বন্ধে যতই চেষ্টা কর, বাঙ্গালা 'আধেঙ্গা'গোছ হইয়া থাকিবে। তবে আমি এ কথা বলি না যে, বাঙ্গালার ৪।৫ কোটি লোকের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভাষাটাকে কতকটা গড়িয়া তুলিতে হইবে না। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা না হউক, মধ্য অঙ্গের শিক্ষা পর্য্যন্ত সাধন করিতে তর্জ্জমার দ্বারাই হউক, স্বাধীন রচনার দ্বারাই হউক, গ্রন্থাদি রচনা চলিতে থাকিবে। কিন্তু মাথার উপরে ইংরাজির যে দাপট আছে সেটা ঘুচিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। অধিকাংশ অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী ইংরাজির দিকেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেন। যদি কখনও তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতে উন্মুখ হয়েন, সেটা যেন তাঁহারা ভাবিবেন বাঙ্গালাকে অনুগ্রহ করিতেছেন।

৮

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮।

অনেক দিন পরে আজ আবার সন্ধ্যার সময় বীডন উদ্যানে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার অবসর পাইলাম।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“আজ তোমার সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, তথায় গেলে না কেন?” আমি বলিলাম,—“শরীর ভাল নহে।” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —“এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় কি?” আমি উত্তর করিলাম,—“হয় বৈকি? আজ সম্রাট্ কনিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিবার কথা আছে।” তিনি বলিলেন,—“দেখ, কালিদাসের পুস্তকে যে ‘নিষ্ক’ কথাটি পাওয়া যায়, আমার মনে হয় উহা আর কিছুই নহে, ঐ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা। নিষ্ক কথাটির অর্থ কি জান? ছেলেদের গলায় অলঙ্কার-স্বরূপ যে সোণার ধুকধুকি পরাইয়া দেওয়া হয়, সেই অলঙ্কারবিশেষকে নিষ্ক বলে। এখনকার ছেলে-পিলের গলায় যেমন নবাবি আমলের মোহর কিম্বা ইংরাজের গিনি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ হয় ত সীথিয় শকরাজের মোহর কালিদাসের সময়ে ব্যবহৃত হইত।”

আমি বলিলাম,—“আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যদি এ কথা ঠিকই হয় যে, কনিষ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, এবং

মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“দেখ, গ্রীক মুদ্রা আমাদের দেশে এত প্রচলিত ছিল যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন নহে। সংস্কৃত ‘দ্রম্য’ নিশ্চয়ই যাবনিক Drachma। অমরকোষে তাম্রের একটি নাম ‘ম্লেচ্ছমুখ’। হইতে পারে, ম্লেচ্ছমুখের বর্ণের মত ইহার বর্ণ, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বাস্তবিকই এই মুদ্রায় ম্লেচ্ছরাজার মুখ অঙ্কিত ছিল।”

আমাদের এই কথোপকথনের মাঝখানে একজন ভদ্রলোক বলিলেন—“শুনিয়াছেন মহাশয়, অনারেবল্ মোহিনীমোহন রায়ের এক পুত্র নোট জাল করা অপরাধে ধৃত হইয়াছে ?” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“মোহিনী বাবু was the architect of his own fortune। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন, আমি তখন তাঁহার ছাত্র। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তখন আমরা দুজনেই প্রথম বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। বঙ্কিম বাবুও আমাদের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর আমি বি, এ, পড়িবার জন্য প্রেসেডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম; মোহিনী বাবু ওকালতি পরীক্ষা দিয়া উকিল হইলেন; রাজসাহী জিলায় ওকালতি আরম্ভ করিলেন। জিলার জজ লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; বলিতেন, মোহিনীর বালকের মত কচি মুখ ও কোঁকড়ান চুল আমার বড় ভাল লাগে। পরে লুইস জ্যাক্সন

যখন হাইকোর্টে আসিলেন, মোহিনী বাবুকে কলিকাতায় আসিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমে মোহিনীবাবুর কপাল ফিরিয়া গেল। লুইস্ জ্যাক্‌সনের আদালতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। সে কালের সেই কমিটি পাস করা উকিল দিগের মধ্যে তিনি বেশ গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে পারিতেন, জ্যাক্‌সনও তাহাই পছন্দ করিতেন। আবার তিনি মোকর্দ্দমা এমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারিতেন যে, প্রথম হইতে জজের কাণ খাড়া হইয়া উঠিত। একবার এক আপিলের মুখবন্ধে তিনি বলিলেন—"My Lord, analysis of evidence may be of two kinds,—the one a commonsense view of the evidence, the other a learned analysis of it. Mr. Field has here given us a very learned analysis ; but your Lordships will, I trust, analyse the evidence in the other way, i.e. will confine yourselves to a commonsense view of the case. আমার বেশ মনে পড়ে, জজ প্রথম হইতেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। লুইস জ্যাক্‌সনের আদালতে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উকিলেরা তাঁহাকে ভয় করিতেন। পচা খাস আপিল দাখিল করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কোনও উকিল আপিলের সওয়াল জবাব করিতে না করিতেই তিনি আপিলের কাগজ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিতেন। তিনি আপনার সুখ্যাতি পর্য্যন্ত শুনিতে ভালবাসিতেন না, বরং যে তাঁহাকে সুখ্যাতি করিত তাহাকেই কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের কথা তোমাকে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি; কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে। একদিন একটা মোকর্দ্দমার argumentএর সময় তিনি লুইস জ্যাক্সনকে একটু compliment দিলেন, অমনি জজ বলিয়া উঠিলেন—You must not expect to win your case by flattering me;' হেম বাবুও অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন—'Then I withdraw the remarks, my lord.' হেম বাবুর ঐ একটা অসাধারণ গুণ ছিল; তিনি সদাই প্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন। একদিন দ্বারি বাবু তাঁহাকে বলিলেন, 'দ্যাখ্ হেম, তোর ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি? এই যে জজদের কাছে এত লাথি ঝাঁটা খাস্, তবুও তুই সর্ব্বদা হাসিস্! তোর মুখ ত কখনও ভার দেখ্‌লুম না।' দ্বারি বাবুর কথায় হেমবাবু হাসিতে লাগিলেন। হেমবাবুর এই সহাস্য ভাব আমার বড় ভাল লাগিত। একবার তিনি আমাকে উপলক্ষ করিয়া একখানা গোটা নাটকই * রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। আমার নিকট সে নাটকের একখণ্ডও নাই। দেখি যদি উমাকালীর নিকট থাকে।

"কিন্তু মোহিনী বাবুর কথা বলিতেছিলাম। একটা বড় জমিদারি কিনিবার সময় লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। আজ সেই বিষয় সম্পত্তি তিন নয় ছয় হইয়া গেল!

* নাকে খৎ।

"তখনকার দিনে জজরা যে উকিলের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহার কারণ ছিল। কমিটি পাশ করা অনেক উকিল ভাল করিয়া গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে ত পারিতেনই না, পরন্তু যাহা বলিতে যাইতেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত রকম দাঁড়াইত। একজন উকিল একবার একটা right of wayর মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিচারপতিকে বুঝাইতে চাহেন যে, যে পথ লইয়া বিবাদ হইতেছে, সে পথে সদাসর্ব্বদাই সকলের গতিবিধি ছিল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—It is a case of promiscuous intercourse, my Lord. জজ ম্যাক্‌ফার্সন্ উকিলের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—You are a born idiot, Babu.

"বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই মোহিনী বাবুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে একবৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম। ডভ্‌টন্ কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ,—সুন্দর, সরল, সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্য কান্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিত। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গুরু হ্যামিল্টন পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত অবস্থাতেই অধ্যাপনা করিতেন। মিষ্টার স্মিথ দুইখানা বড় বড় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন,—ডাক্তার ডফের জীবন-চরিত ও বিশপ কটনের জীবন-চরিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দার্শনিক জর্জ্জ পেনের এক-

খানি পুস্তক আমি এমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে, তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমার সহাধ্যায়ীরা সকলেই ল্যাটিন জানিত, আমি উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিজ কক্ষে বসাইয়া ল্যাটিন শিখাইতেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন অধ্যাপনা করিলেন না। কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি শ্রীরামপুরে গেলেন; সেস্থানে 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। সম্পাদক হইয়া তিনি কিছু গোল করিয়া বসিলেন। আমি জানিতাম, তিনি একটু গোঁড়া খ্রীষ্টান। সেই জন্যই গোল বাধিল। তখনও সিপাহীবিদ্রোহবহ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' এমন উৎকট খ্রীষ্টান সুরে লিখিতে আরম্ভ করিল যে, গভর্ণেণ্ট পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান না হইলে ইংরাজের আর রক্ষা নাই, এই কথাই উক্ত পত্রিকা বারম্বার বলিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং দেখিলেন, এ এক নূতন বিপদ; এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপে আবার অশান্তির তুফান উঠিতে পারে। সবিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি মুদ্রাযন্ত্রের একটি আইন করিলেন, এবং উহার ফলে পত্রিকাখানা বন্ধ হইয়া গেল।

"বহুদিন পরে আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি, একদিন শ্রীরামপুর রেল ষ্টেসনে মিষ্টার স্মিথকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই,—সেই সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্যকান্তি। তিনিও আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন; আমার কিন্তু ভরসা হইল না যে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি।

"হিন্দু কলেজের কাপ্তেন রিচার্ডসনের ন্যায় মিষ্টার স্মিথ যশস্বী হইতে পারেন নাই। আমি কাপ্তেনের কাছে কখনও অধ্যয়ন করি নাই ; কিন্তু যখন আমি সংস্কৃত কলেজে পড়ি তখন তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, লর্ড মেকলে রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপীয়রের কিয়দংশের আবৃত্তি শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। পরে কিন্তু মিষ্টার বীটনের (Drinkwater Bethune) সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য হয় ; তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার এই কর্ম্মত্যাগের একটা নিগূঢ় কারণ ছিল ; কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চাকরিটি গেল। অল্পকাল পরেই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক সিঁদুরিয়াপটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে মেট্রোপলিটান কলেজ নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। এখন হ্যারিসন রোডে সে বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই, তাহার উপর দিয়া উক্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে 'বিধবা-বিবাহ নাটক' প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কলেজটি কিন্তু বেশি দিন টিকিল না। আমি যখন বি, এ, পাস করিয়াছি, তখন শুনিলাম যে, কাপ্তেন রিচার্ডসন কয়েক মাস প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারি প্রেসিডেন্সী কলেজের

ছাত্র। আমি তাঁহার মুখে রিচার্ডসনের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন 'Selections from English Poets,' 'Literary Leaves,' প্রভৃতি যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন সেই কয়খানা পুস্তকেই তিনি যে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ইংরাজ ও স্কচ্ কবিদিগকে যথোচিত সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি সেক্সপীয়রের যে সনেটটি পাঠ করিলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোবদন হয়েন,—'Master mistress of my passion' ইত্যাদি, রিচার্ডসন সেই সনেটটিরও একটি সুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠেন' 'I wish Shakespeare had never written a sonnet like this.' মেকলে একবার হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্রদের পরীক্ষা লইলেন। ঘটনাচক্রে যে কবিতাটি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেটি মিল্টনের একটি সনেট—যে কবিতায় তিনি ভয় প্রকাশ করিতেছেন যে, একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি কাপ্তেন, কর্ণেল ইত্যাদি সেনানায়কদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যেমন পিণ্ডারের বাড়ীটি ভগ্ন করেন নাই সেইরূপ তাঁহারাও যেন ইংরাজ কবির বাড়ীটি না ভাঙ্গেন। কবিতাটির প্রথম ছত্র captain or colonel বলিয়া আরব্ধ হইয়াছে; পাঠ করিবার সময় কলোনেল উচ্চারণ না করিলে ছন্দপতন হয়। একজন ছাত্র

প্রথমেই কবিতাটি পড়িবার সময় কলোনেল পড়িয়া গেল। মেকলে আনন্দিত হইয়া যুবকটির নিকটে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

"সম্প্রতি না কি রমেশচন্দ্র দত্তের এক ভাগিনেয়ীর সতীদাহ হইয়াছে? কাগজওয়ালারা না কি খুব বাহবা দিতেছে? দেখ, হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইয়া দিতে না কি নারাজ ছিলেন। একজন ইংরাজ এই প্রথার বিরোধী হইলেন ইহা কিরূপে ঘটিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন বটে, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জোর এই পর্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেন যে, সতীদাহরোধ করিলে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তিনি আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইতে চাহেন নাই।

"সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন স্যর চার্ল্‌স্ নেপিয়র উক্তপ্রদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তথায় আর সতীদাহ চলিবে না; কারণ সিন্ধুজয়ের দশ বৎসর পূর্ব্বেই লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইংরাজ রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের বিশিষ্ট গৌরব এই যে, উহার মধ্যে সতীদাহ-প্রথা অথবা ক্রীতদাস আদৌ থাকিতে পারিবে না। যখন ঘোষণা প্রচারিত হইল, তখন তথাকার কয়েকজন প্রাচীন ধর্ম্মাভিমানী চাঁই-গোছ হিন্দু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—হুজুর,

সতীদাহ উঠাইয়া দিলে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন— সতীদাহ তোমাদের ধর্ম্মে অনুমোদিত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে ধর্ম্ম মানি, এ প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অতএব জানিয়া রাখিও, যিনি ইহাতে লিপ্ত হইবেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ফাঁসি দিব।—It may be your religion to burn your widows, but remember, it is my religion to hang those who will be concerned in it.—এই কথায় ভট্টি-কাব্যের দুইটি শ্লোক আমার মনে পড়ে। রাক্ষস মারিচ বলিতে-ছেন—আমাদের ধর্ম্ম এই যে, দ্বিজ ও বেদযজীদিগকে হত্যা করা, নগরকে প্রেতের আবাস ভূমি করা—

অগ্নো দ্বিজান্ বেদযজীন্ নিহন্মঃ
কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং

ইত্যাদি,

রামচন্দ্রও উত্তর দিলেন 'তোমাদের যদি ঐ ধর্ম্ম হয়, আমারও এক ধর্ম্ম আছে,—যাহারা ঐ রূপ করিবে, তাহাদিগকে নিধন করা—

ধর্ম্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ং
অন্যো ব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্ম্মঃ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন
রাজন্যবৃত্তির্ধৃতভাস্বরাস্ত্রঃ॥

ইহাতে দেখিতেছি যে, যে স্থানে যত উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মবীর (men of action) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমান অবস্থায়

সংস্থাপিত হইলে সকলেরই একস্বরে 'রা' বাহির হয়। কোথায় ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র, কোথায় স্যর চার্ল্‌স্ নেপিয়র! কিন্তু দেখ যেন দুজনে পরামর্শ করিয়া কথা কহিতেছেন।

"যখন লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ উঠাইবার হুকুম প্রচারিত হইল, তখন না কি হিন্দুসমাজের চাঁইগণ ইংলণ্ডে সে বিষয়ের প্রতিবাদের জন্য আন্দোলন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে তথায় একজন কৌন্সিলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কৌন্সিলি আর কেহ নহেন, আমাদিগের পরিচিত মিষ্টার বীটন (John Drinkwater Bethune), যিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর পরে এখানে আইনের সদস্য Law Member হইয়া আসেন। তিনি না কি যখন সতীদাহের স্বপক্ষে কৌন্সিলি হয়েন, তখন এই প্রথার বিশেষ বিবরণ, ইহার ঘোরতর অত্যাচারপূর্ণতা, ইহার লোমহর্ষণ নৃশংসতা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরে এ দেশে আসিয়া এবং এস্থানের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তখন উহার স্বপক্ষে এক সময়ে কৌন্সিলি হইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ দুর্ব্বিষহ অনুতাপযন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে দেশের নারীজাতির প্রতি এই প্রকার অত্যাচারপাতকে আমি লিপ্ত হইয়াছি, উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেই দেশের নারীজাতির কিঞ্চিৎ উপকারার্থ আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়া যাইব। তদনুসারেই তিনি বেথুনকলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

"আমি দেখিতেছি যে এখনও প্রাচীনধর্ম্মানুরাগী কোনও কোনও মহাত্মা ব্যক্তি সতীদাহ-প্রথার প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ প্রদর্শন করেন; এবং গায়ের জোরে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত যেন কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন। ইহাতে ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। Lecky's History of Rationalism পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ-পোড়ান য়ুরোপেও বড় অধিক দিন উঠিয়া যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার এবং য়ুরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড নামক যুদ্ধ এবং ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঘোরতর রক্তারক্তি ব্যাপার, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনোমধ্যে একটা বিষণ্ণভাব আসিয়া পড়ে এবং মনে হয়, How melancholy is the history of mankind when contemplated in connection with events like these! উন্নতি, উন্নতি বলিয়া আমরা যে বড়াই করিয়া থাকি তাহা কত সামান্য! এবং কি প্রকার অত্যাচারপরম্পরার মধ্যে সেই যৎসামান্য উন্নতি লাভ করা গিয়াছে ভাবিলে এক প্রকার হতাশ্বাস হইতে হয়।

"এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা যায়। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও সনাতন ধর্ম্মের দিকে যে একটা reaction আসিয়া জুটিয়াছে তাহার প্রভাবে বিধবা বিবাহের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই

যে, কোঁতের দলও সেই বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করেন। এ স্থলে বক্তব্য যে কোঁতের বিবিধ apercuর মধ্যে একটি apercu * আছে তাহার নাম তিনি দিয়াছেন বিশুদ্ধ বিবাহ -- chaste marriage। তিনি বলেন যে, যদিও পুরাকালে প্রথম উদ্যমে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সন্তান উৎপাদন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে শারীরিক বৃত্তি চরিতার্থ করা, চরমাবস্থায় কিন্তু বিবাহের সেই উদ্দেশ্য স্বীকার করা যায় না। স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির স্বভাবগত অনেকগুলি বৈলক্ষণ্য আছে। এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রকর্ষ (perfection) স্ত্রীজাতিতে আছে, যথা, স্নেহ, পরানুগ্রহ, কোমলতা, সন্তানপ্রতিপালনতৎপরতা, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি -- যেগুলি সেই পরিমাণে সাধারণতঃ পুরুষজাতিতে স্বাভাবিক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষজাতিরও এইরূপ কতকগুলি প্রকর্ষ আছে, যথা সাহস, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়,

* কিছুকাল হইল ফরাসি ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এই একটি নূতন কথা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজিতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার অনুরূপ কোনও শব্দ বাহির হয় নাই। মোটা মুটি apercu শব্দের অর্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কোনও চিন্তয়িতা কোনও একটা গুরুতর এবং নানাবিষয়-প্রসবী (prolific) idea উদ্ভাবিত করেন যাহার আন্দোলন দ্বারা অনেক অভিনব তত্ত্বকথা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাদৃশ ideaকেই apercu কহে। কোঁতের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই প্রকার বিস্তর apercu লক্ষিত হয়, তাহার এক একটি অবলম্বন করিয়া এক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোঁৎ কিন্তু দুচারি কথার ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই সারিয়া দিয়া গিয়াছেন।

নাছোড়বান্দা এই বৃত্তি, যেগুলি সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির নাই। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল হয় ত বলিবেন যে, স্ত্রীপুরুষজাতির এই স্বভাবগত বিভিন্নতা উভয়ের চিরন্তন প্রচলিত শিক্ষার ও অভ্যাসের বিভিন্নতা-বশতঃ ঘটিয়াছে এবং অভ্যাসের কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া দিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সেই বৈসাদৃশ্য উঠিয়া যাইবে। কোঁতের মত কিন্তু তাহা নহে। যেমন স্ত্রীজাতির শ্মশ্রু উদ্ভেদ হয় না, চুল বড় হয়, স্তনদ্বয় বিবৃদ্ধ হয়, শরীরে লোম অল্প হয়, অস্থি কোমল থাকে, অধিকাংশই cartilage, স্বভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ physiological। পুরুষেরও তদ্রূপ। এখন কোঁৎ বলেন যে, যখন বিবাহ দ্বারা দুই জাতি পরস্পর সর্ব্বদা কাছাকাছি থাকে, তখন একের দেখিয়া অন্যের হীনতাগুলি কতকদূর অপনীত হইতে থাকে। পুরুষের স্নেহবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, নারীর অধ্যবসায় প্রবল হয়, ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্ত্তন অপ্রার্থনীয় নহে। ইহাতে সমাজের উপকারই আছে, এবং বিবাহ দ্বারা সেই অভিপ্রায়টি কিয়দংশে সিদ্ধ হয়। অতএব যদি বিবাহের প্রধান অভিপ্রায় ইহাই হইল, তবে রিপুর চরিতার্থতার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ এরূপ অনেক রুগ্ন শীর্ণ, জীর্ণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগের পক্ষে সন্তানের উদ্ভব উচিত নহে। আজিকার কালে একথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগ যে পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বভাবের দোষও তদ্রূপ। কেবল আমরা অদ্যাপি চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ এই গুরুতর শারীরতত্ত্বানুসারে

চলিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমাদিগের বড়ই লজ্জার ও ঘৃণার কথা। আমি স্বয়ং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মৃগিরোগগ্রস্ত, অথচ আরও অনেক সেই সেই রোগগ্রস্ত জীবকে পৃথিবীতে আনিবার উদ্যোগ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কাণ্ড আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ইহা ভাবিয়া থাকেন। বাপ মা ছেলেপুলের বিবাহ দিবার সময়ে একটু ভাবেন বটে, কিন্তু বিবাহ একবার হইয়া গেলে দম্পতি আদৌ এদিকে লক্ষ্য করে না। আবার য়ুরোপে এতন্নিবারণার্থ যে সকল প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে, যাঁহাদিগের অন্তঃকরণে ভব্যতার লেশ আছে, তাঁহারা কেহই বোধ হয় সেগুলির অনুমোদন করিবেন না। কেহ কেহ এই উপলক্ষে ভ্রূণহত্যাপ্রথাও চালাইতে চাহে। তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা ভদ্রলোকের নিকটে নিতান্ত জুগুপ্সিত ব্যাপার। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোঁৎ বিশুদ্ধ বিবাহ নামে এক নূতন কাণ্ড চালাইতে চাহেন। তিনি বলেন—বিবাহ কর, কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিও না। ইহারই নাম chaste marriage। এই কথা শুনিবামাত্র বোধ হয় পনের আনা তিন পাই লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবেন এবং কোঁৎকে বদ্ধ পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যদিচ কাম-রিপুর তুল্য প্রবল বৃত্তি আর নাই, তথাপি কোঁতের নূতন কাণ্ডটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তর ভণ্ডামি

প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা একেবারে আদ্যোপান্ত ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এতদিন সমাজ কখনই উহা সহ্য করিত না।

"এখন বলিতে চাহি যে, যেমন কোঁতের মতে বিশুদ্ধ বিবাহ এক নূতন কাণ্ড, সেইরূপ ধর্ম্মবিবাহ religious marriage আর একটি নূতন কাণ্ড। তিনি বলেন, ধর্ম্মবিবাহসূত্রে গ্রথিত হইলে এ জন্মে আর বিবাহ করা চলিবে না। পতিই মরুন, আর পত্নীই মরুন, উভয়কেই এ জন্মের মত মৃত পতি বা পত্নীর ধ্যানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যদি একবার পতির বা পত্নীর স্বভাবের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবর্ত্তমানে তাঁহার স্বভাবের ধ্যান করিয়াই বিশেষ আনন্দ সহকারে জীবন নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। কোঁৎ এই নিয়ম কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষেই একেবারে জারি করিতে চাহেন; এবং এখনকার কোঁতের দলও এই জন্য বোধ হয় বিধবাবিবাহের প্রতি বিরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বোধ হয় বলেন যে, পরিণামে যখন বিধবা-বিবাহ উঠাইয়া দিতে হইবে, তখন উহা আর চালান কেন?

"কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, এখন যে অবস্থা আছে, তাহাতে স্ত্রীজাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার হইতেছে এবং পুরুষজাতির ঘোর স্বার্থপরতা প্রকটিত হইতেছে। পুরুষ ষাট বৎসরের বুড়া হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শব্দটিও করে না; কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা

হইলেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন, ভ্রাতার সংসারে আধা দাসী হইয়া কাল যাপন করুন, ভাইপো ভাইঝিদিগকে মানুষ করুন, ইহাই তাঁহার প্রতি আদেশ। এখনকার সর্ব্ব-সাধারণ 'এজু'র (Educated শব্দের এই সংক্ষেপ ব্যবহার করিলাম) দলও এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আজকাল আধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়াছে। 'এজু'রা বলেন, বিধবা-বিবাহ চালাইলে নারীর আধ্যাত্মিকতার হ্রাস হইবে। এরূপ ব্যবস্থা মন্দ নহে বটে! আমরা পুরুষ, মেঠাই মণ্ডার ভাগটা আমরাই সমস্ত গ্রহণ করি, আধ্যাত্মিকতা ওরফে কঠোর ব্রত পালন নারীর স্কন্ধেই চাপাইয়া দেওয়া যাউক। হ্যাম্লেটের ওফিলিয়া ভ্রাতা লেয়ার্টিসকে বলিতেছেন—'দাদা, কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিবার পরামর্শ আমাকে ত খুব দিলেন, কিন্তু নিজে যেন কেবল মেঠাই মণ্ডা লইয়াই কাল যাপন করিবেন না, তাহাতে আপনারও চরিত্র-ভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা আছে।' মিল্টন বলিয়াছেন—Spare Fast that with the gods doth diet ;—মিল্টনের এই উক্তি অকপট বটে। ইহার মধ্যে তাঁহার মনে একখানা মুখে একখানা ছিল না। কিন্তু 'আইভানহো'তে বনবাসী সন্ন্যাসী (Monk) যখন রিচার্ড রাজাকে বলিতেছেন—আমার ঘরে ছোলা ভাজা ছাড়া অন্য কোনও ভাল খাদ্য দ্রব্য নাই,—তখন রিচার্ড অনেক পীড়াপীড়ি করাতে পরিশেষে তাঁহার ভাঁড়ারের মধ্য হইতে কালিয়া, কাবাব, পুরি প্রভৃতি ভাল ভাল

খাবার বাহির হইতে লাগিল। নারীর প্রতি আমাদের পুরুষ-জাতির উপদেশটা কিয়দংশে তদ্রূপ। পুরুষ বিধবাদিগকে বলেন—ওগো শ্রীমতীগণ, একাদশী কর, একসন্ধ্যা খাও, চুল মুড়াইয়া ফেল, সৌখীন খাওয়া দাওয়া এককালে ত্যাগ কর, শরীর খুব ভাল থাকিবে, দীর্ঘকাল নীরোগে জীবন কাটাইবে। পুরুষ নিজে কিন্তু চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ছাড়িবেন না। ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা! এই আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিবার জন্য আমরা পুরুষ রৌদ্রবৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিব, স্ত্রীলোক কিন্তু দিতে পারিবে না। শীতকালে জামাজুতা পরিব, নারী কিন্তু শীতে হি হি করুক আর ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াক। আমরা অগ্রে আহার করিব, নারী আমাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া প্রাণধারণ করিবে।

"আমি এই সকল কথা বলাতে অনেকেই চটিয়া উঠিবেন, কিন্তু হক্ কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। আজকাল অনেক পরিবারের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু হিন্দুর ঘরে গার্হস্থ্য জীবনের spirit (ভাবভঙ্গি) এইরূপ কি না তাহা অপক্ষপাতী লোক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাই অনুরোধ।"

৯

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মুখে আমি শুনিতেছি যে, কেহ কেহ বলিতেছেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার কিছু আন্তরিক আক্রোশ আছে; সেই কারণেই আমি তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টি কথা এরূপ বলিয়াছি যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ reflection হয়। আমি আপনি ত বুঝিতে পারি না, এমন কি কি কথা বলিয়াছি। আমি মনে মনে জানি যে, আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত, এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ব ও ঔদার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয় ত দুই একবার তোমাকে বলিয়াছি যে, He could not bear a brother near the throne. কিন্তু এই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু পৃথিবীর বিস্তর বড় লোকেরই চরিত্রে দেখা যায়। বড় লোকের স্বভাবে, বিশেষতঃ যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক তাঁহাদিগের স্বভাবে এ দুর্ব্বলতাটুকু হইবে বলিয়া যেন বিধিনির্ব্বন্ধ আছে। যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক, তাঁহারা নিজের ভাবভঙ্গি লইয়া এতই বিভোর হইয়া পড়েন যে, অন্য ধরণের ভাবভঙ্গি উৎকৃষ্ট হইলেও উহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। এই নিমিত্তই বোধ হয় মেকলে স্থলবিশেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহারা পরের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক

হয়েন না—'Great authors are seldom good critics.' মাঝামাঝি গোছের বুঝদার লোক হইলে সমালোচক ভাল হয়। ইহা যেন হইবারই কথা। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম যে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ? আর আক্রোশের কথা যে বলিতেছ, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং সেই বিপ্রকৃষ্ট ভাব (distance) নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াও ঘুচাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তুমি জান, তোমাকেই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, আমার জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমারই সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনি সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা আমি ঘটনার দুই এক বৎসর পরেই কথা উঠিলেই সকলের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং এখনও করি। আমি কায়মনোবাক্যে বুঝি যে, তিনি আমার ভালই করিয়াছিলেন। সুতরাং সে আক্রোশের লেশমাত্র এক্ষণে আমার মনে নাই এবং তৎপ্রবর্ত্তিত হইয়া কিছুমাত্র মালিন্য মনে ধারণ করি না এবং কোনও বিরুদ্ধ কথাও আমার মুখে আসে না।”

কথাটা অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য আমি বলিলাম, “দেখুন, বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পয়ার ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বহুকাল পরে মাসিক পত্রিকায় সাবেক ধরণের পয়ার পাইয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমার মনে হয়

আবার কিছুদিন খাঁটি নিভাঁজ পয়ার যদি আমাদের কবিরা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর কিছু না হউক, মুখ বদলান হয়।”

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—“তোমার কথায় বিদ্যাসাগরকে মনে পড়িল। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গলের’ কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি ‘হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া’ ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—‘দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষা।’

“আমার বিশ্বাস মদনমোহনের ‘বাসবদত্তা’ তাঁহার পাঠদ্দশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি ‘রসতরঙ্গিণী’ নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পদ্য ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল। আমি তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা

যে প্রশংসাপুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোল্‌তা হইতে পারিল না।

"বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে, অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছা-কাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্ প্রভেদ। যাহাকে backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয় ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কি না সন্দেহ।

"বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদরে পড়ি

না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগর এ দিকে পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধি বড় কম ছিল না। একসময়ে শ্রীহট্ট জিলা নিবাসী কোনও এক ব্যক্তি চাকরির প্রার্থনায় তাঁহার শরণাগত হয়। অন্ততঃ তিনি সুপারিস দিয়া তাহাকে কোথাও একটা চাকরি করিয়া দেন, সে এ প্রকার বাঞ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃতকলেজের বড় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন। নিজে চাকরি দিবার ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না, আর সুপারিসের দ্বারা যে চাকরি দিতে পারিবেন এ ভরসাও তিনি বড় করিতেন না। উমেদারটি নিজের কার্য্যসিদ্ধি ও বিদ্যাসাগরের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সিলেটী পাটি উপহার দিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে কিন্তু উহা লইতে চাহেন নাই; উমেদারের পীড়াপীড়িতে শেষে লইলেন। আমার নিকট এই গল্প করিবার সময় বিদ্যাসাগর কহিলেন, 'আমি বেশ বুঝলুম যে, চাকরি না হোলে উমেদার পাটির দাম চা'বে। এই ভেবে আমি সে পাটি ব্যবহার করলুম না, তুলে রাখলুম। ফলে আমি যা ভেবেছিলুম তাই ঘটল। উমেদার যখন কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করে চাকরির বিষয়ে হতাশ্বাস হোলো, তখন বিদায় নেবার সময় বল্লে, 'মশাই পাটির দামটা পেলে ভাল হয়'। আমি বল্লুম, 'বাপু, তোমার পাটি একদিনের জন্যে ব্যবহার করি নি; ঐ দেখ, তোলা রয়েছে; তুমি

ফেরত নিয়ে যাও।' উমেদার কতকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাটি নিয়ে বিদেয় হোলো।'

"সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি শেষাশেষি, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর, বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড় বড় দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু যাহারা দু' দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডেপোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে হাঁটাহাঁটি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইদানীং 'ল্যাজকাটা' বা 'টিকিদাস' এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং' এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন। লালমোহন প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তারের ভ্রাতা ছিলেন, সহোদর কিনা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থটা হইল এই—পণ্ডিতের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মূর্খ। বিদ্যাসাগর এই পরিহাসের ব্যাখ্যাটি লইয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন এবং বলিতেন যে, লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর অশ্রদ্ধা হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে মিশিয়া গেল। ইহাতে তিনি ঐ পণ্ডিত জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

"প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুত ছিল। আকার খর্ব্ব বটে, কিন্তু এ দিকে খুব গ্যাটাগোঁটা, যাহাকে সংস্কৃতে 'অবষ্টব্ধ' বলে, সেই গোছের ছিল। তিনি শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিতে পারিতেন, এবং খুব পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রাতঃকালে যাত্রা করিয়া সদ্যই হাঁটা পথে বাড়ী পৌঁছি-তেন; পায়ে কেবল এক চটি জুতা; হয় ত বার আনা পথ সুধু পায়েই যাইতেন, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নরৌদ্রও ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। এই হাঁটাপথে যাইবার সময়ে এক দিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন। তিনি বলিতেন 'আমি এক দিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে একটি খোড়ো বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি, এমন সময়ে বাড়ীর ভেতরে থেকে গুটি দুই তিন ছেলে নাচতে নাচতে আর গানের সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক্। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল পার্ব্বনের মত দু' এক দিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।' এই গল্প করিতে করিতে কখনও কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল অসিত।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যায়ন কালে বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রকার গ্যাঁটাগোঁটা শরীরের জন্য তাঁহারা উঁহাকে 'টিপলে' বলিয়া ডাকিতেন; এবং

বিদ্যাসাগর যখন কোনও একটা শাস্ত্রের—বিশেষতঃ স্মৃতিশাস্ত্রের ভালরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহারা বলিতেন, 'আমাদের টিপ্‌লে না হোলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।'

"বিদ্যাসাগর যখন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, 'শূদ্রস্য ভার্য্যা শূদ্রৈব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে' এই মনুবচনের বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্পূর্ণ সম্মত। শেষে কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন, এবং বিদ্যাসাগরের সহিত বাদানুবাদে (controversy) প্রবৃত্ত হইলেন!

"পদব্রজে পথপর্য্যটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষাবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন 'খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব?' ডাক্তার বলিলেন, 'যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, 'তাহ'লে ত রাত্রি দিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।'

"কলেজের প্রিন্সিপাল হইবার পর তিনি কিছুদিন কলেজের ইমারতেই বাসা করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মালির ঘরের দিকে মাটি ফেলিয়া মস্ত একটা কুস্তির আখ্‌ড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। জীবহিংসা পরিহারের জন্য তিনি কিছুকাল

মৎস্যমাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাছুরকে কষ্ট দিতে হয় বলিয়া দুগ্ধ পর্য্যন্ত বোধ হয় ছাড়িয়া ছিলেন। যাহা হউক এ বাতিক বোধ হয় অধিক দিন চলে নাই, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে হয় ত বঞ্চিত হইতে হইত; তিনি কখনই বেশীদিন বাঁচিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে কোঁৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, সৃষ্টিকাণ্ডে ইহা একটি অসম্পূর্ণতা (imperfection) এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম করুণাময়ত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্তি যে, জীবহিংসা ব্যতীত মানুষের মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হইবার যো নাই। অতএব পশুদিগকে যত কম হয় কষ্ট দিতে হইবে; যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; এবং সেই যে চরম মুহূর্ত্ত—যখন আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে যাইতেছি, তখন যেন তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকা আদৌ না টের পায়; এই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং প্রাণসংহার ব্যাপারও এরূপ অনিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাশূন্য রীতিতে সম্পাদন করা উচিত যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয়। আমি জানি যে, এখনকার উদ্ভিদভোজীর দল কোঁতের এই সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এখনও শরীরবিধান শাস্ত্র দ্বারা (Physiology) উদ্ভিজ্জভোজনের সর্ব্বাভিপ্রায়সাধনতা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

"এই প্রসঙ্গে সুরাপান সম্বন্ধে কোঁতের মত প্রকটন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলেন, alcohol এর এমনই একটি ধর্ম্ম আছে, যে পেটে পড়িলেই পেট ও মস্তিষ্ক উভয় সংযোজক ganglionic nerve কে তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া দেয়, এবং সেই

বিকার মস্তিষ্কে নীত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ alcohol সংযোগ ঘটিলে উহা স্থায়িভাবে বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্য মহম্মদ সুরাপান তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পক্ষে ঐকান্তিক নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করাতে কোঁৎ মহম্মদকে আকাশে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং কথায় কথায় বলেন (The incomparable Mohammad) অর্থাৎ মহম্মদের জুড়ি নাই।

'আজকাল শুনিতেছি যে, ডাক্তার চুনিলাল বসু নাকি সবিস্তারে সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাঁহার মতে মস্তিষ্ক ও যকৃৎ এই উভয় করণই (organs) alcohol এর দ্বারা উচ্ছন্ন যায়। এতদ্দেশে নব্যযুবকের দল কিন্তু আজও একথা বুঝিতেছেন না। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকেই ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিমিতমাত্রায় alcohol সেবার দ্বারা উপকার বৈ অপকার নাই। তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক সম্বন্ধও তদ্রূপ আবশ্যক। আমি কিন্তু এই দুইটি মতই ঘোরতর অপসিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞান করি। শেষোক্তটি পরিহার করিলে যে শরীর ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষই সাধিত হইবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের স্নাতক ব্রাহ্মণদিগের আচার। ইদানীন্তনকালে স্যর আইজাক্ নিউটনের মত মস্তিষ্কচালনা কে কবে করিয়াছে? তিনি ৮৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। যতদূর জানা আছে তাঁহার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল।

কোঁতের মতও ইহাই ছিল। ঐ শারীরিক সম্বন্ধ যাহাতে এককালেই উঠিয়া যায়, ইহা বিজ্ঞানচর্চ্চাকারী ব্যক্তিমাত্রের

visionary idea স্বরূপ মনে ধারণ করিয়া রাখা উচিত, তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ; এবং সেই জন্য বিড়ম্বরসিকদিগের বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছিলেন। এমন কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রতি একটু ঠাট্টার বারি বর্ষণ করিয়াছেন। মিল বলেন 'এবিষয়ে কোঁৎ একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে যে কি তাহা আমি বলিতে চাহি না।' কোঁৎ বলেন, রোমান ক্যাথলিক-দিগের কুমারী জননী (Virgin Mother) একটা Theological Conception বটে, কিন্তু জিনিষটা কি তাহা আমি Physio-logistদিগকে অনুসন্ধান করিতে বলি। নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমারীর সন্তান উৎপন্ন হয়, এ বিশ্বাসটি য়ুরোপে ত এক্ষণে হাস্যাস্পদ হইয়াছে এবং বিস্তর লোক এই কারণেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অশ্রদ্ধা আমি এই ভাবে বলিতেছি যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ধর্ম্মনীতির উপর কাহারও বিরাগ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা হয় নাই ; কিন্তু ঐ ধরণের মূলীভূত বিশ্বাসগুলির উপর—যথা কুমারীর সন্তান উৎপত্তি, একখানি রুটীতে বিস্তর লোক খাওয়ান, কথার দ্বারা উৎকট রোগ আরাম করা ইত্যাদি বিষয়ে ক্রমেই লোকের অশ্রদ্ধা হইয়া আসিতেছে। হিউম এই অশ্রদ্ধা প্রথম তাঁহার রচনায় প্রকাশ করেন। তখন গোঁড়া খৃষ্টানদিগের তরফ হইতে তাঁহার উপর বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি যে, তাঁহার কথাই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। আমেরিকার কোনও এক মণ্ডলীতে বক্তৃতা দিবার সময় একজন পাদ্রি বলিয়া উঠিলেন, আজ ১৮০০ বৎসর হইল

কেহ মরিয়া জীয়ন্ত হয় নাই। সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে আকাশবাণীর ন্যায় একজন আওয়াজ দিলেন, 'কখনও কেহ হয় নাই।' যীশুখৃষ্টের গোর হইতে উত্থান—ইহার প্রতি লোকের ত এইরূপ শ্রদ্ধা। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ সন্তান উৎপত্তির ideaটি ততদূর হাস্যাস্পদ হয় নাই। তাহার সাক্ষ্য ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত, মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত, আর কাদম্বরী আখ্যায়িকাতে পুণ্ডরীকের জন্ম। ইহা ব্যতীত পুরাণের মধ্যে মানসপুত্র ত কথায় কথায় দেখা যায়।

কোঁতের কথা এক্ষণকার দিগ্‌গজ শারীরবিধানবেত্তাদিগের নিকট কতদূর অনুমোদিত তাহা আমি জানি না, এবং সে মীমাংসা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। মানুষের দেহযন্ত্র (বা organism) একটি নানাব্যাপারসঙ্কুল অতি জটিল (complex) কাণ্ড; বহু সংখ্যক factor একত্র হইয়া ইহা চালিত হইতেছে। একটি factor বদল করিয়া দাও অমনি ইহার চলন ক্রিয়া বদলিয়া যাইবে। এইরূপ জটিল কাণ্ডের মধ্যে চেষ্টা করিলে অনেক প্রকারের অদল বদল আনয়ন করা যাইতে পারে। আজ কাল surgery দ্বারা যে সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইতেছে, সে গুলিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোঁৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, কুমারীর সন্তান উৎপত্তি কেনই বা একেবারে ঐকান্তিক নিরবচ্ছিন্ন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইবে! যদি বল, সে চেষ্টার দরকার কি? উত্তর—দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণ করা উচিৎ নহে কি? একজন ফরাসি

ডাক্তার এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর এক উত্তর এই যে, সন্তান উৎপত্তি যদি আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে ম্যাল্‌থসের Population difficulty অনেকটা ঘুচাইয়া দিতে পারা যায়। কোঁৎ কিন্তু ম্যালথসকে মানিতেন না। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, ম্যাল্‌থসের সিদ্ধান্তে (Theory) গণনার ভুল (arithmetical mistake) আছে। এই অংশে অদ্যাপি আমি কোঁৎকে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই ; এবং কোন্ স্থানে যে ম্যাল্‌থসের গণনার ভুল আছে তাহাও ঠিক করিতে পারি নাই। ফলতঃ ম্যাল্‌থসের রচনার সহিত প্রথম পরিচয় হওয়া অবধি আমি যেন একটা নূতন আলো পাইয়াছি, মনে হইয়াছে ; এবং তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। যাবৎ সাধারণে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছে, তাবৎ পৃথিবীর বিস্তর লোককে অদ্ধাশনের যন্ত্রণা ও দুর্গতি ভোগ করিতেই হইবে। হয় ত শতকরা ১০ জন পেট ভরিয়া খাইতে পায়, আর ৯০ জন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে ; এই যে বর্ত্তমান অবস্থা, ইহা ঘুচাইবার উপায়ান্তর নাই। অনেকে ভাবেন, বড় মানুষরা ঘরের টাকার থলি বাহির করিয়া দিলে এ যন্ত্রণা ঘুচিতে পারে ; শুদ্ধ বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ এ অবস্থা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু এটা কাযের কথা নহে। বড় মানুষরা আপনাদের সমস্ত টাকা বাহির করিয়া দিলে হয় ত ৫।৭ বৎসর একটু স্বচ্ছল দেখা যাইবে। কিন্তু তাহার পরেই আবার যে কে সেই। এত সন্তান জন্মিবে, অল্প বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে, যে আবার খাদ্যদ্রব্যের

পূর্ব্ববৎ টানাটানি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে ভালরূপ না খাইতে পাওয়ার দরুণ বিস্তর শিশু এবং বিস্তর বয়স্ক ব্যক্তি পর্য্যন্ত কালগ্রাসে পতিত হয়। দিন কতক যদি এই অবস্থা বন্ধ হয়, তবে সেই সকল বয়স্ক ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়া আবার টান ধরাইবে এবং বড় মানুষদিগের টাকা অল্পকালমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এ কথা ম্যাল্থস্ এবং তাঁহার পরে ষ্টুয়ার্ট মিল অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়ছেন। অতএব বড়মানুষদিগের উপর স্বার্থপরতাদোষ আরোপ করা বৃথা।

"তবে কোঁৎ এ কথা বলেন বটে যে, পৃথিবীতে এখনও বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া জমি বাহির করা যাইতে পারে। সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিকে উর্ব্বরা করা যাইতে পারে। সমুদ্রকে হটাইয়া দিয়া আবাদের জমি বাহির করা যাইতে পারে। মৎস্য-মাংসাদি খাদ্যের পরিমাণও অপরিসীমরূপে বাড়াইবার উপায় আছে। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতা ত্যাগ করা আবশ্যক। হয় ত এখন হইতে দশ হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর সমস্ত resource নিঃশেষিত হইবে এবং তখন এই জনসংখ্যার সমস্যা মালুম হইতে আরম্ভ হইবে। উপস্থিত কালে আমাদিগকে ও বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইতেছে না।

"অতএব সাধারণ ধর্ম্মনীতির উন্নতি এখন আবশ্যক। কোঁতের অভিপ্রায় বোধ হয় এই প্রকার ছিল। আর সংযমের জন্য তিনি এক উপায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, আহারের খর্ব্বতা করিলেই রিপুর দমন হয়; যে পরিমাণ খাইতেছ, তাহার অর্দ্ধেক কর, না হয় সিকি কর, গায়ের জোরটুকু যাহাতে বজায় থাকে

তাহার অতিরিক্ত খাইবে না এই নিয়ম কর, তাহা হইলে নিশ্চয় রিপুর দমন হইবে। এ কথা তাঁহার নিজের নহে। তিনি একখানি গ্রন্থ পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন, নাম Imitation of Christ, ভাষা Latin, গ্রন্থকার Thomas á Kempis—লোকটা ভগবান লইয়া বিভোর হইয়া ছিল। ঐ গ্রন্থ হইতে কোঁৎ আহার-লাঘবের উপদেশটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে লেখা আছে, বুভুক্ষাবৃত্তিকে দমন কর, তাহা হইলে আর সকল দুর্দ্দান্ত রিপুরই দমন হইয়া আসিবে।

"এই উপলক্ষে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে Thomas á Kempis গ্রন্থের যে যে স্থানে ভগবানের নাম করিয়াছেন, কোঁৎ সেই সেই স্থলে Humanity এই শব্দটি বসাইতে বলেন। তাহা হইলেই গ্রন্থের পূর্ব্বতন উপদেশপূর্ণতা বজায় থাকিবে। কোঁৎ এই ভাবেই গ্রন্থখানি লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন। Kempis যেমন ভগবানে বিভোর, কোঁৎ তেমনি Humanity লইয়া বিভোর। ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের হস্তচিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পান, কোঁৎ তেমনি আহার, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি সর্ব্বত্র Humanityর হস্তচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া গদ্‌গদ হইয়া যাইতেন এবং আনন্দপরিপ্লুতভাবে তাহা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। স্থইডেনবর্গকে লোকে বলিত God-intoxicated man—ভগবান লইয়া মাতোয়ারা। কোঁৎকে তদ্রূপ বলা যাইতে পারে, Humanity-intoxicated man—humanity লইয়া মাতোয়ারা।

১০

৪ঠা আষাঢ়, ১৩১৮।

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় * মহাশয় গিল্যাণ্ডর্সের বাড়ী একশত ত্রিশ টাকা মাহিনায় কর্ম্ম করিতেন। অনেক দিন হইল তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, এবং উক্ত হৌস্ হইতে মাসিক ১৩০৲ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি বলিলাম—"অনেকবার আপনার মুখে কলিকাতায় পুরাতন থিয়েটরের গল্প শুনিয়াছি। আজ সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনার সমসাময়িক অভিনেতা আর কেহ জীবিত নাই।"

তিনি বলিলেন, হাঁ, ঠিক বটে; যাঁহাদের সহিত আমি 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই।"

"তখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। চড়কডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ

* ২১ এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে

পুরাতন প্রসঙ্গ

৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের Rehearsal হইত, তালিম রাজেন্দ্রবাবুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আমাদের এই Rehearsal প্রত্যহ হইত না, শুধু শনিবার ও বুধবার রাত্রিতে হইত। নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন না; একদিনমাত্র কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

"আমাদের সেই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে একটিবার মাত্র শ্যামবাজারে থিয়েটর হইয়াছিল। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একজন ধনকুবের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি জন্মগ্রহণ করি নাই।

'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভবাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজনে যখন তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি সখের দল বাজাইত। আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম। আমার বক্তৃতা ছিল—'তাহার পর সেই আপন অভীষ্টদেবাভিনিবিষ্ট আদিশূর—' (ও কি ও, তুমি আমার বক্তৃতাটাও লিখিয়া লইতেছ যে? ছাপাইবে না কি?—আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া যাউন।")

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"তাহার পর সেই আপন

অভীষ্ট-দেবাভিনিবিষ্ট আদিশূর রাজা কাণ্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। পরে তাঁহারা সদাব্রত হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক যজ্ঞশীল আদিশূর মহারাজের আদেশানুসারে গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হওয়ায়, বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন। যথা শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ-বংশজাত আদি বরাহ বন্দ্য। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশপ্রসূত সুলোচন ভট্ট, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশোৎপন্ন ধুরন্ধর মুখোটি, সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভবংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গুলী ও সুধীর কুন্দ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশপ্রসূত সুরভি ঘোষাল ও কবি কাঞ্জিলাল।'

"বক্তৃতাটা আর কত লিখিবে? আমি তখন অল্পবয়স্ক, কিন্তু অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলাম।

"থিয়েটরের দ্বিতীয় পর্ব্ব ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) বাড়ীতে। শকুন্তলার * অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎ

---

* নাটকখানি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' রচয়িতার মাতামহ ৺নন্দকুমার রায় প্রণীত। ১২৮৯ সালে দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :-

"১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক রচয়িতাদিগের পক্ষেও আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসী ৺আশুতোষ বাবুর বাটীতে তৎপরে জনাইনিবাসী জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের ভবনে অভিনীত হয়।

বাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন Stageএর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। পাইক-পাড়ার রাজারা—প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের নিজ বাটীতে একটি রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'রত্নাবলী' ও মাইকেল মধুর 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

"শকুন্তলা সাজিলেন শরৎবাবু। দুষ্যন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি রালিমেভ্রোজানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা – গ্রে ষ্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলি-সের ইন্স্পেক্টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের Interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কণ্বমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) Stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি

"ইদানীং পরম সম্মানভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গর্ভনর জেনরল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদবৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকা[illegible] করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয়; অভিনয় কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া তুষ্টিলাভ করিয়াছিলেন। সে দিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কায ছিল whistle দেওয়া, পট-ক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি।

"একটি কৌতুককর ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ যখন টিকিট দেখাইয়া উঠানে নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের পোষাক দেখিয়া 'মহাশয়, Front seat,' 'মহাশয় Side seat' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। অবশ্যই বাড়ীর কর্তৃপক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না।

"একব্যক্তি 'শকুন্তলা'র গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম। ভাল নামটি কি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ঐ রকম দেখ, ধীরাজের সঙ্গে অনেকদিন একত্র নিমন্ত্রণপার্টিতে ও বড়লোকদিগের আসরে ফূর্ত্তি করিয়াছি ও গান গাহিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের আসল নামটা কি তাহা জানি না; কখনও জানিতাম কি না, তাহা বলিতে পারি না।

"কবিচন্দ্র ছাতুবাবুর নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন—'দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত হয়।' কবিচন্দ্র বলিল—'জয় জয় রাম সীতারাম,' (এই বুলি তাহার মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল) 'আমি কি জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন? এমন গান গাহিব যে মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন?"

"৩।৪ বৎসর পরে ছাতুবাবুর বাড়ী আমরা 'মহাশ্বেতা'

অভিনয় করি। অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক এবং ক্ষেত্রমোহন সিংহ নায়িকা হইয়াছিলেন।

"থিয়েটরের তৃতীয় পর্ব্ব—পাইকপাড়ার বাড়ীতে। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইল। আমি দর্শক হিসাবে গিয়াছিলাম। দৈত্য সাজিয়াছিলেন তারাচাঁদ গুহ, শিবচন্দ্র গুহের পুত্র। বাগ্‌বাজারের যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় যযাতি সাজিয়াছিলেন। গায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে কুচবিহার-রাজে একটা বড় চাকরি পাইয়াছিলেন, সাজিয়াছিলেন শর্ম্মিষ্ঠা। মাইকেল মধুর নাম তখন খুব জাহির হইয়াছিল।

"চতুর্থ পর্ব্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার ওরফে 'মণিলাড়্' অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হয়। আমি কর্ণ সাজিয়া ছিলাম। দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stageএর উপর ঝল্‌মল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, জানি না।

"এইস্থানে একটি কথা, মজার কথা বলি শুন। কালীসিংহ একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের দল ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাড়িবার ব্যবস্থা করা হইল এই অভিনয়ের দিনে। যখন

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ টিকিট দিয়া একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা ছিল—

'আর না পাইব যেতে,
না পাব Lemon খেতে,
তুমি ত এ সব সাধে
বিসম্বাদ ঘটালে।
পেয়েছ ইংরাজি জুতো,
মনোমত মজবুত,
আমার কপালে জুতো
আর নাহি ঘটালে॥
বিলাতি এসেন্স নানা,
দেখেনি তোর নানী নানা,
আপনি মেখেছ কত,
আমারে না মাখালে।
পুরাতন মদ যত
সব তব বাসগত,
আপনি খেয়েছ দাদা,
আমারে না খাওয়ালে॥

কে লিখিয়াছে এবং কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না।

"পঞ্চম পর্ব্ব—সিঁদুরিয়া পটিতে মেট্রোপলিটান কলেজে 'বিধবা

বিবাহ' নাটক অভিনীত হইল। বিহারী চট্টোপাধ্যায় নায়িকা হইয়াছিলেন। পরে বিহারীবাবু বেঙ্গল থিয়েটরে খুব যশস্বী হইয়াছিলেন।

"ষষ্ঠ পর্ব্ব—ঠাকুরবাড়ী।

"প্রথমে গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীর দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরকে (তখনও তিনি মহারাজা হয়েন নাই) বলিলেন—"আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।" তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম। ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র Stageএ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন; দৌড়িয়া Stageএ আসিয়া করযোড়ে তিনি বলিলেন—"মহারাজ, মহারাজ, বড় বিপদ! ছোটরাণী নীলবাঁদর দেখে মূর্চ্ছা গিয়াছেন, আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে আসুন।"

"আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম, শরৎবাবু ছিলেন আমার Understudy। আমার অভিনয় দেখিয়া রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ এত প্রীত হইলেন যে, তিনি গ্রীন্ রুমে আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিলেন। বড় রাজাও খুসী হইয়া আমাকে বলিলেন—"Mohendra Babu, you are the second best বিদূষক I have seen." কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, ফিনান্স আপিসের কর্ম্মচারী, বড় রাজার বিশিষ্ট বন্ধু, তখনকার দিনে সব চেয়ে

সেরা বিদূষক ছিলেন। পাইকপাড়ায় 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে তিনি বিদূষক হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—Motion, স্বগতঃ, চমকে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

"ফিনান্স্ আপিসের দীননাথ ঘোষ ছিলেন Stage Manager; শরৎ বাবু Prompter। তিনি Stageএর ভিতর হইতে বাঁয়া-তবলা বাজাইতেন। এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, শরৎবাবুর মত পাখোয়াজ বাজাইতে সে সময়ে খুব কম লোক পারিত; বরোদা হইতে আগত পাখোয়াজের ওস্তাদ মৌলা বক্স ঠাকুর-বাড়ীতে শরৎবাবুর বাজনা শুনিয়া তারিফ করিয়াছিলেন।

"ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটরের জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলী, দীন ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত, আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।

(খ) "ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতীয় পর্ব্ব—মহারাজা (তখন তাঁহাকে আমরা বড় রাজা বলিতাম) নিজ বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন। তথায় তাঁহার স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' প্রথম অভিনীত হইল। কমিটি বাছাই করিলেন;—বিখ্যাত ধ্রুপদ খেয়ালের ওস্তাদ মদনমোহন বর্ম্মন হইলেন 'বিদ্যা', আমি হইলাম 'সুন্দর'।

"তৎপরে 'রুক্মিণী-হরণ' ও 'মালতীমাধব' অভিনীত হইল। মালতীমাধবে আমি 'মকরন্দ' সাজিয়াছিলাম। ক্ষেত্র সেন 'মালতী' ও যদু চাটুয্যে 'মাধব' সাজিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকনাট্যও

অভিনীত হইত, যথা,—'উভয় সঙ্কট', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'বুঝলে কি না'। শেষোক্ত নাটিকা মহারাজের স্বরচিত। এইটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা ছোকরা দুষ্টুমি করিয়া একখানা কেতাব লিখিল, 'কিছু কিছু বুঝি',—তাহার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) "মহারাজের বাগানে—'মালতীমাধব' অভিনীত হইল। এইবার আমি 'মাধব' সাজিয়াছিলাম। 'মালতী' ক্ষেত্র সেন, আর হরি বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঘোরঘণ্ট যোগী'। বড়লাট লর্ডনর্থব্রুক অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন; ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ীতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পালা শেষ হইলে আমরা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় মহারাজা বলিলেন—'পোষাক ছাড়িবেন না, লাট সাহেব তলব দিবেন। কথা কহিতে হইলে খবরদার Sir বলিবেন না, My Lord বলিবেন।' মাইকেল মধুও খুব করিয়া আমাকে শিখাইলেন, My Lord বলায় ভুল না হয়।

"হঠাৎ আমাকেই ডাকা হইল। বড়লাট ডাকিতেছেন! মাথা ঘুরিয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিলাম। যাইবার সময় মনে হইল, যেন কাণের কাছে বড় রাজা বলিলেন 'My Lord ভুলিবেন না;' মনে হইল যেন মাইকেল মধু বলিয়া দিলেন, সাবধান! 'My Lord'। লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Were you the hero when I came to his residence? কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল 'Yes, Sir!' তৎক্ষণাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন Yes, my Lord; there were two

heroes, he was one of them'. বস্! সব মাটি! সহস্র দর্শকের সম্মুখে দীপালোকিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া মনে বড় সাহস হইয়াছিল। এই লাট সাহেবের সম্মুখেও ত দুইবার অভিনয় করিলাম। তবে কেন এমন হইল? এমন না হইলে গিল্যাণ্ডর্স হৌসে কেরাণীগিরি করিব কেন?

"আর একটি ব্যাপার বলি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার বামুনে কপাল কত মন্দ। দর্শকবৃন্দের মধ্যে রেওয়ার মহারাজা ছিলেন। তিনি দু' গাঁটরি কাশ্মীরি শাল ও এক থান মোহর আনিয়া বড় রাজাকে বলিলেন—আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি।' বড়রাজা বলিলেন, 'ও কথা মনেও আনিবেন না, উঁহারা সকলেই আমারই মত ভদ্রলোক, উঁহারা কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না।' আমরা সকলেই বড় রাজার সমকক্ষ! দান গ্রহণে অসমর্থ! ওগো বিদেশী রাজা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে আমি ঠাকুরবাড়ীর বড় রাজাবাহাদুরের সমকক্ষ নই, নই, নই! আমি অত্যন্ত দীন হীন ব্রাহ্মণ, গিল্যাণ্ডার্স হৌসের সামান্য কেরাণী মাত্র। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি, রাজার দান গ্রহণে অসমর্থ হইব কেন?

"লাট সাহেবের কাছে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কাশ্মীরি শাল ও মোহরের থান বুদ্ধি-বিপর্যায় ঘটাইয়া দিল। বড়রাজার Prestige অক্ষুণ্ণ রহিল। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ আমার দুঃখে হাসিতে লাগিল।

"ইহার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা হইলেন, এবং তদুপলক্ষে আমাদিগের প্রত্যেককেই এক এক যোড়া গঙ্গাজলে শাল উপহার দিলেন।

"সপ্তম পর্ব্ব। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সান্যালদিগের বাড়ীতে পেশাদারি থিয়েটর খুলিলেন। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত।

আমরা retire করিলাম।

* * *

৭ই আষাঢ়, ১৩১৮।

মহেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "মুখুয্যে মহাশয়, আজএই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, 'মহেন্দ্র বাবু আমার বাল্যবন্ধু, বোধ হয় আমার চেয়ে এক বৎসরের বড়। তিনি তোমাকে যে বাঙ্গালা Stageএর ইতিহাস দিয়াছেন, এমনটি আর কেহ দিতে পারিবে না। তাঁহার যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি 'চার এয়ারের তীর্থযাত্রা' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমার দাদা সেই পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলেন, 'মহেন্দ্র যে এমন বই লিখিতে পারে, তাহা কে জানিত? বাস্তবিক ছেলেটি একটি genius।' 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় যখন দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ধরিতে পারি নাই যে মহেন্দ্র অভিনয় করিল।'

"মুখুয্যে মহাশয়, আপনার সেই পুস্তক একখানি দেখিতে পাই কি?"

তিনি বলিলেন—"দুঃখের বিষয়, আমার নিকট একখণ্ডও নাই। আর যে থিয়েটরে মাতিয়াছিলাম, তখন আর ওসব খেয়াল করি নাই। শনিবারে প্রায়ই বড় রাজার Emerald Bowerএ কিম্বা ছোট রাজার "প্রমোদ-কাননে" কিম্বা ছাতুবাবুর পেনিটির বাগানবাড়ীতে গান, বাজনা, আনন্দ উৎসবে কাটাইতাম। বড় রাজার জন্মদিন অক্ষয় তৃতীয়া। ঐ উপলক্ষে কিছু বেশী ধূম-ধাম হইত। ধীরাজ (ও ইদানীং প্যারীমোহন কবিরত্ন) গান বাঁধিতেন, আমি তাঁহাদের সহিত গাহিতাম। ছাতুবাবুর বাগানে নীলমাধব ডাক্তার আমার সাকরেদ ছিলেন।

"এক এক দিন ছোট রাজা আসিয়া আমাদের গানে যোগ দিতেন। এক দিন তিনি বলিলেন, 'ধীরাজের সেই গানটার অর্থ আমি আজ নিশ্চয়ই বাহির করিব, তোমরা সেই গানটা গাও ত?' আমরা গান ধরিলাম—

আমায় ফের ঘর-অঙ্গনা,
আমি কলার করব না,
তুমি কালশশী, গোকুলবাসী
দা'র চাল বাড়ন্ত ঘুচ্‌লো না।
গেল ভজার মার কাঁথা,
মোলো রাজা মান্ধাতা,
ইচ্ছের আরম্ভ হবে ওষুধ পাই কোথা?
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,
আমার আইবুড় নাম ঘুচ্‌ল না।

আমি ফলার কর্‌ব না।
কাগে নিয়ে গেল কাণ,
তোমায় দিব খইয়েন ধান,
আউটে ক্ষীর কোরো,
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ।
আবার শিবে শুঁড়ি কাটা গেল,
আমার খেউরি হওয়া হোলো না।
আমি ফলার কর্‌ব না।

দেখ, যাহার মাথামুণ্ড কোনও অর্থই করা যায় না, ছোট রাজা তাহার একটা সোজা মানে বাহির করিবেন কি করিয়া?

"ধীরাজ আবার গান ধরিত (এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, কোনও একটি ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই গান রচিত হইয়াছিল) ধীরাজ গান ধরিত—

কোম্পানীর চাকরি গেছে, আ মরি,
নাই সে শরীর
রাই কিশোরীর,
আগে পৃথিবীতে পা দিতেন না,
এম্নি ছিলেন অহঙ্কারী।
পিরু গরু নাই বিচার,
চপ্ কট্‌লেট অনিবার,
আহার হোতো না বাবুর
বিনে সে 'ফাউল করি'।

বৌমায়ের Beer যেতো,
Moselle এতে মাথা ধর্‌তো,
বাজে লোকের বরাদ্দ ছিল ব্রাণ্ডি।
এখন dish হয়েছে কলাপাত,
চাম্‌চে হয়েছে হাত,
ব্রাণ্ডির বদলে এখন
যা করেন মা ধান্যেশ্বরী।

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু এই সকল গান যখন আমার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠে, তখন আমারও দেহে চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। Auld Lang Syneএর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝিবে? কিন্তু যদি আমার কথায় সে সময়কার একটি চিত্রও তোমাদের মনোমধ্যে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।"

১১

১লা আশ্বিন, ১৩১৮।

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম "আজ আপনি অনুগ্রহ করিয়া কবি বিহারীলালের কথা বলুন।"

তিনি বলিলেন—

"বিহারীলাল আমার খুব বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। আমা অপেক্ষা তিনি ৩।৪ বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু সে কারণে আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায় তেজীয়ান্ ও অকুতোভয় ছিলেন। আমি চিরকালই ক্ষীণজীবী, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এমন কি ভক্তি বলিলেও হয়, ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতা, লোকজ্ঞতা, আমা অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক ছিল; কিন্তু আমার এই সকল হীনতাসত্ত্বেও আমি লেখাপড়ায় অগ্রসর থাকাতে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা ঢেক ফাজিল হইয়া পরস্পর অনেকটা পোষাইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও স্নেহানুগত্য ঘটিয়াছিল।

"বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন। আহিরী-টোলার নিকটে তাঁহার বাটী, এবং আহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্য কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বাল্যকালোচিত বিবাদকলহপ্রসঙ্গে

লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে গুপ্তি তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল। সন্নিকটে একজন পাহারাওয়ালা ছিল; সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল. 'বাবু কি হইয়াছে? কে আপনাকে মারিয়াছে?' বিহারী পুলিসে জানান কাপুরুষতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, 'কেহ আমাকে মারে নাই, চৌকাটে মাথায় চোট লাগিয়াছে।' আঘাত-কর্ত্তা বালক তখনও পালায় নাই, নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল। বিহারী পুলিসে জানাইতেছে না দেখিয়া তাহার হৃদয়ে একটা উৎকট ভয় জন্মিল; সে ভাবিল, বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিসের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিভূত হইল যে, সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পায়ে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া ফেলিল।

"বিহারীর লেখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তি-বৈশিষ্ট) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষক ও বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। তিনি আমাদের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ায়

অনেক বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ যথা,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন; নাটকের প্রাকৃত ভাষা লাল অক্ষরে, তাহার ঠিক নীচেই প্রাকৃতের সংস্কৃত অনুবাদ কাল অক্ষরে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় হদ্দ ৫।৬ ছত্র মূল সংস্কৃত, বাকি অংশ ইংরাজি ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইংরাজি ব্যাখ্যার মধ্যে আবার স্থানে স্থানে তিন জন টীকাকারের সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি ইংরাজ অক্ষরে ছাপা ছিল। কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মুদ্রণকার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; বহিখানির দাম হইয়াছিল উনিশ টাকা। বিহারীদের যদিও অন্নকষ্ট ছিল না, তথাপি ১৯৲ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা কিনেন এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাঁহারা ছিলেন না। বিহারীর পিতা যাজ্যক্রিয়া করিতেন, অনেকগুলি ধনবান্ সুবর্ণবণিক্ তাঁহার যজমান ছিল। অন্যান্য জাতির পুরোহিতদিগের অপেক্ষা সুবর্ণবণিক জাতির পুরোহিত-দিগের আয় অনেক অধিক। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাঁহার আব্দার অগ্রাহ্য হয় নাই; পিতা ১৯৲

দিয়া পুত্রকে 'শকুন্তলা' কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধহয় বিহারীর তখন ইংরাজী ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু'পাঁচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল; বাঙ্গালাসাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। তিনি অল্পবয়সেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নূতন 'ধর্ত্তা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত; এবং সেই 'ধর্ত্তা' উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লেখাতেই লক্ষিত হয়। আমার জ্যেষ্ঠ তাঁহার পদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নূতনত্বের জন্য বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নূতনত্ব আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব, তাহা ঠাওরাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজিতে পোপ ও তাঁহার অনুগামী কবিদিগের পর ক্র্যাব, কাউপার, বায়রণ যে এক নবীনতা আনিয়া-

ছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সেই প্রকারের ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং সেকেলে ভাব সকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।

"তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা 'সঙ্গীতশতক' পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পাঠক-সমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থরচনার দোষে নহে, পাঠকদিগের সহৃদয়তার অসদ্ভাবে। সঙ্গীতশতক গ্রন্থ এক শত বাঙ্গালা গানে গ্রথিত। গানগুলি 'কাণু ছাড়া গীত নাই' সে ধরণের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর বর্ণনা বা একটি চমৎকার সন্ধ্যার আকাশের বর্ণবৈচিত্র্য বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই রচনা এরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়। বিহারীর গলার সুর ছিল না কিন্তু সুরবোধ ছিল, এবং অনেকগুলি সুর তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। অনেক গান আমার নিজে নিজে গাহিয়া গাহিয়া মুখস্থ হইয়াছে। একটি গান—

(সুর বেহাগ)

নধর নূতন তরুবর কিবা সুশোভন।
সাদরে দিয়েছে এসে লতাবধূ আলিঙ্গন।

উভয় উভয় পাশে, বাঁধা বাহু-শাখা-পাশে
কুসুম বিকাশি হাসে ভাসে ভ্রমর-গুঞ্জন।
মিলায়ে বায়ুর স্বরে, কুহুস্বরে গান করে
নাচে আনন্দের ভরে ক'রে বাহু প্রকম্পন।

আর একটি গান—

(পুরবী)

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে অতি মনোহর
পরিয়াছে পাঁচরঙ্গা সুন্দর অম্বর।
হাসি হাসি চন্দ্রানন, আধ ঘন আবরণ
আধ প্রকাশিত আভা কিবা শোভাকর।
কালো মেঘ কেশমাঝে, সাদা মেঘ সিঁথি সাজে,
তার মাঝে জ্বলে মণি তারকাসুন্দর।
নীলজলধর পরে, যেন নীল গিরিবরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে রূপে উজলি অম্বর।

এরূপ মূর্ত্তিমান্ সন্ধ্যা-বর্ণনা আমার অতি অপূর্ব্ব বোধ হয়।
আর একটি গান—

(সোহিনী)

কোথায় রয়েছ, প্রেম, দাও দরশন
কাতর হয়েছি আমি করি অন্বেষণ।
কপটতা ক্রূরমতি, বিষময়ী বক্রগতি
দংশিয়েবু তোমারে ঝি করেছে নিধন।

আর একটি গান—

(ঝিঁঝিট)

প্রাণ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার।
হেরিলে তব বদন, যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উছলি উঠে আনন্দ অপার।

আবার —

(বাহার)

হায়, সুখময় ফুলবন হয়েছে দাহন।
নীরব এখন কোকিলের কুহুরব অলির গুঞ্জন।
আজ পূর্ণিমার ভাসে, ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে প্রমোদিত বন।

একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্ব্বতা আছে। বিহারী বিশেষ যত্ন করিয়া উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন। But the book fell still-born from the press, পঞ্চাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এইত বাঙ্গালা পাঠকসমাজের সহৃদয়তা। কিন্তু বিহারী নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার রচনাতে পদার্থ আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি কবিতা রচনা ছাড়েন নাই।

"ইহার পর তিনি 'বঙ্গসুন্দরী' 'সুরবালা কাব্য' 'সাধের আসন' 'সারদা মঙ্গল' এই কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট অতি চমৎকার গ্রন্থ রাখিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে, আপাততঃ লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাঁচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে। অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার পুত্ত্ররা তাঁহার গ্রন্থাবলি ছাপাইয়াছেন। আজকাল বাজারে সেগুলির কাট্‌তি কিরূপ আমি জানি না, এবং বিহারীর উল্লিখিত ধ্রুব জ্ঞান সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে তাঁহার রচনার প্রতি আমার সেই প্রকার admiration এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের হৃদয়েও সেই admiration প্রস্ফুরিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি বিহারীর বিষয়ে এত প্রশংসাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, তাহা আমি হেন বিহারীর ভক্তও যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করি। এমন কি রবি ঠাকুর এক প্রকার নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পদ্যরচনা বিষয়ে তিনি বিহারীর ছাত্র, তাঁহার লেখা হইতে অনেক hint পাইয়াছেন।

'বঙ্গসুন্দরী' একখানি অতি সুললিত পদ্যগ্রন্থ। ইহাতে নারীজাতির সুকোমল চরিত্র পরিপাটিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বিহারী কোঁতের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং 'বঙ্গসুন্দরীর' মধ্যে কোঁতের ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নারীজাতিকে বিহারী কোমলতা, করুণাপরায়ণতা এই সকল গুণে

পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন, এবং সেই অভিপ্রায় উক্ত কাব্যে সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

'সুরবালা' কাব্যের চমৎকারিতা সমালোচনা দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। স্বয়ং পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য যিনি অনুভব করিতে না পারেন, কাব্যের ভাবগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

'সাধের আসন' ও 'সারদামঙ্গলের' বিষয়েও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে আমার নিজের মত বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, 'সারদামঙ্গল' বিহারীর শেষাশেষি সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে তাঁহার হৃদয়ে জর্ম্মাণধরণের একটু অস্ফুটতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছি। আমার নিকট যাহা অস্ফুট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবগ্রাহী ব্যক্তির নিকট তাহা সেরূপ না বলিয়া বোধ হইতেও পারে। ভাবগ্রাহিতা-বিষয়ে আমার আত্মশ্লাঘা নাই। বিজ্ঞানের পরিস্ফুটতা আমার চিত্ত কিছু পছন্দ করে, সুতরাং আমি যাহা অস্ফুট বলিব, তাহার মধ্যে হয়ত সুগভীর তত্ত্ববিশেষ নিহিত আছে। আমি ত কোন কীটাণুকীট—নিউ-টনের মত মহীয়ান্ পুরুষ মিল্‌টনের Paradise Lost পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন What does it prove ? ইহাতে প্রমাণ হইল কি ? কিন্তু তাহা বলিয়া Paradise Lost কেহ অনাদর করে না। লোকে কেবল এই মাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে,

নিউটন বিজ্ঞানে বড়লোক হইলেও কাব্যশাস্ত্রে বালকের ন্যায় ছিলেন।

"যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।

"বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিম্বা প্রথম উঠ্‌তি বয়সে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ চরিত্রস্খলন হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জন্য আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌পথাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ইহা আমি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ভাবিতাম। একবার মাত্র তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল, কিন্তু অল্পকাল পরেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। তাহাতে আবার পূর্ব্বতন সদ্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইল এবং আমি দেখিলাম যে, আমার প্রতি বিহারীর স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

"তাঁহার রচনাগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হই বলিতে পারি না।

"দেখিতে বিহারী প্রথমে যে প্রকার বলিয়াছি, যাবজ্জীবন সেই রকমই ছিলেন, দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়াদেহ ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপ্‌ছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালীজাতির সেরূপ খুব কমই আছে।

"একবার তাঁহার সহিত গঙ্গাতীরে ষ্ট্রাণ্ড পথ দিয়া আসিতেছিলাম। এক জন গোরা আমাদিগের সামনা সামনি হইল। এরূপ স্থলে প্রায় বাঙ্গালীকেই পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, গোরা সোজা চলিয়া যায়। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, গোরাটি বিহারীর মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখপানে একবার তাকাইয়া আপনা হইতেই পাশ কাটাইল; আমরা দু'জনে সোজা চলিয়া আসিলাম।

"আর একবার, বিহারীর মুখে শুনিয়াছি যে, বড়বাজারের বাঁশতলার গলির ভিতর দিয়া মহাসমারোহে বর যাইতেছিল। অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তর লোক বর

দেখিবার জন্য গোলমাল ও হুটোপাটি করিতেছিল। এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইতেছিল; পুলিশের লোক দু'ধারি দাণ্ডা চালাইতেছিল; তাহার মধ্যে একজন গোরা কনষ্টেবল ছিল, সে আবার একটু অধিক মাত্রায় ঐ কায করিতেছিল। বিহারী সেই সময়ে পথের ধারে এক রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দিকে দাণ্ডা উত্তোলন করিল। গোরা রাস্তায়, বিহারী একটু উচ্চ স্থানে; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গোরার মার খাইতে হয়। তখন তিনি আর কিছু না করিয়া অম্লানবদনে গোরার বুকের উপর এমনই সজোরে এক লাথি হাঁক্‌রাইলেন যে তাহাকে চিৎপাত হইতে হইল। সেই সময়ে ভিড় ভয়ানক বাড়িয়া গেল। গোরাটি উঠিয়া অত ভিড়ের মধ্যে বিহারীকে ঠাহর করিতে পারিল না। বিহারীও পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে পশ্চাৎপদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।

১২

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আবার তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "দ্বারি বাবুর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তালতলায় নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। সে সময়ে কয়েক-জন ইংরাজ Positivist আমাদের দেশে ছিলেন; সিভিলিয়ন গেডিজ (Geddes I. C. S.) খুব পণ্ডিত ছিলেন, বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে কায করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সহিত positivism সম্বন্ধে আমার আলাপ হইয়াছিল কি না স্মরণ হয় না। কটন, বেভরিজ, হ্যাগার্ড এবং আরও ২।১ জন ছোকরা সিভিলিয়ন positivist বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই ছোকরা সিভিলিয়ন দুইজন বিশেষ কোনও অপকর্ম্ম করায় সর্ব্বিস্ হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। ইংরাজরা আমাদের ক্লবে আসিতেন না। বাঙ্গালী সভ্যদিগের মধ্যে ছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় (W. C. Bonnerjee) ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, আমার ছাত্র নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার।

"ইঁহারা সকলেই যে পূরা কোঁতের শিষ্য ছিলেন তাহা বলা যায় না; কিন্তু Humanityর কার্য্যে জীবনকে পর্য্যবসিত করা

আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই মতটি সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কোঁতের মতাবলম্বী ছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার ঝোঁক হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কোঁতের মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি Humanityর নাম দিতে চাহিয়াছিলেন, 'নারায়ণী'। এতদ্ব্যতীত কোঁতের অভিপ্রায় ছিল যে Humanityর মূর্ত্তি যিশু খৃষ্টের জননী Madonnaর প্রতিকৃতির অনুরূপ করিতে হইবে। ম্যাডোনা যেন একটি দুগ্ধপোষ্য বালক ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাই ভবিষ্যতে visible representation of Humanity বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু যোগেন্দ্র বলিতেন যে, ঘাগরাপরা মূর্ত্তি আমাদের দেশের লোকের ভাল লাগিবে না। সেই জন্য তিনি নারায়ণীর একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা ও কপালে সিন্দুর দেওয়া নারী একটি শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত যোগেন্দ্র শেষাশেষি কোঁৎকে ঋষি নাম দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার একটু বাদানুবাদও হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, অমরকোষে লিখিতেছে, ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ অর্থাৎ ঋষিরা সত্যভাষী; ইহার অর্থ সাধারণ সত্যবাদী নহে, ইহার অর্থ বাক্‌সিদ্ধ; যে ব্যক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, যেমন শাপ দেওয়া ও বর দেওয়া, তিনিই প্রকৃত ঋষিপদবাচ্য। ঋষি শব্দের প্রাথমিক অর্থ যে এই প্রকার সঙ্কীর্ণ (limi-

ted) তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যোগেন্দ্রের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম আমার মনে এই অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল। এ কথা আমি যোগেন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম; এবং সেই নিমিত্ত কোঁৎকে ঋষি নাম দেওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র কিন্তু আমার এই পরাঙ্মুখতাদর্শনে কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যোগেন্দ্র কোঁতের যে হিন্দুয়ানি সংস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই। কটন প্রভৃতি ইংরাজ positivistরাও যোগেন্দ্রের নারায়ণীমূর্ত্তির বড় একটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উক্ত-প্রকার প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া যোগেন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশং প্রভৃতি সূর্য্যের স্তব পর্য্যন্ত positivism ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্ত উদ্যম দেখিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, পাছে জিনিষটা বিবেচক লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহার পর অল্পকালমধ্যেই যোগেন্দ্র লোকলীলা সম্বরণ করিলেন; সুতরাং এই সকল উদ্যমও বন্ধ হইয়া গেল।

"যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ দেশে positivismএর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না। এখন ত ইহা এক প্রকার নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছে। যদিও অবিদিত ভাবে কোনও কোনও ব্যক্তির ইহার দিকে ঝোঁক থাকে, তাহার প্রকাশ নাই; পাঁচ জন একত্র হইয়া সমালোচনা করিবারও কোনও ব্যবস্থা নাই। ফলতঃ আমার বোধ হয় যে, এ

দেশ এখনও কোঁতের ধর্ম্মের জন্য পরিপক্ক হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। যখন য়ুরোপেই উহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তখন এ দেশের কথা ত অনেক দূরে। কোঁতের উৎসাহী শিষ্যেরা খুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন বটে যে, কালসহকারে তাঁহার ধর্ম্মের প্রাধান্য হইবেই হইবে; কিন্তু আমি সে ভরসা তত দূর করি না। এত বড় বড় লোককে হার্বার্ট স্পেন্সার ও মিলের এত গোঁড়া দেখিতে পাই যে, সেই স্রোত কোন দিক দিয়া বন্ধ হইবে তাহা কিছুতেই ঠাহরাইতে পারি না।

"তালতলায় আমাদের ক্লবের যে অধিবেশন হইত, তথায় কোঁতের কোন এক গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ প্রথমে পাঠ করা হইত; পরে তৎসম্বন্ধে যাঁহার যাহা মন্তব্য উপস্থিত হইত, তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। সভার অধিবেশন দুই এক বার কে. এম্. চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতেও হইয়াছিল। সেই সময়ে চ্যাটার্জ্জি এক একটি বক্তৃতা দিতেন। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জি, যিশু খৃষ্ট ও তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য যে জ্যোতিষশাস্ত্রের রূপান্তর বিশেষ, এ ideaটি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কোনও কোনও য়ুরোপীয় চিন্তয়িতা ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়া থাকিবেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের সাংঘাতিক বিরোধী এই প্রকার কতকগুলি মত সময়ে সময়ে য়ুরোপে দেখা দিয়াছে। দেখ, Strauss নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত Leben Jesu নামক গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব হইবা মাত্র খৃষ্টনামগুলি স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি

ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল গতেই খৃষ্টানেরা এরূপ প্রক্রিয়া করিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থখানি এখন কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কোঁৎও একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মের নামমাত্র প্রবর্ত্তক; প্রকৃত প্রবর্ত্তক সেণ্ট্ পল। যেমন বুদ্ধের বিষয়, তেমনই কোনও কোনও ব্যক্তি যীশু খৃষ্টের বিষয়েও সন্দেহ করেন যে, ঐ নামে কেহ কখনও ছিল কি না। কিন্তু এই সকল ধারণার বনিয়াদ কিছুই উপলব্ধ হয় না। হয় ত খৃষ্টানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদ্বারা সে সকল জব্দ হইয়া গিয়াছে। মিল কিন্তু বলেন, Bless them that curse you, Love them that hate you, Do good to them that spitefully use you এ প্রকার কথা বলিবার লোক কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত হইবার নহে। সত্য সত্য তেমন মানুষ অবশ্যই জন্মিয়া থাকিবে। মিলের এই কথাটা অনেকাংশে মনে লাগে বটে; কারণ কল্পনা যতই স্বাধীন হউক, তথাপি উহা সীমাবদ্ধ। এ দিকে প্রকৃতির ক্ষমতা এত বেশী যে সময়ে সময়ে এমন এক একটা সত্য ঘটনা ঘটিয়া উঠে যাহার নিকট কল্পনা অপদস্থ হইয়া যায়, যথা হানিবল, নেপোলিয়ন, জোন অব্ আর্ক্, শার্লটি কর্দ্দে।”

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আপনার কখনও positivism সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল?” তিনি বলিলেন “না—না। তবে ঘটনা চক্রে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি কোঁতের শিষ্য। আমার দাদার মৃত্যু হইলে আমি যেন সমস্ত সংসার

অন্ধকার দেখিলাম। হৃদয়ের আবেগে একখানা খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি কোঁৎকে পারিসের ঠিকানায় লিখিলাম; আমার নিজের ঠিকানা দিয়াছিলাম Care of Iswar Chandra Vidyasagar। কোঁৎ যে তখন জীবিত নাই তাহা জানিতাম না। চিঠিখানা dead letter আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরের হাতে পড়িল। আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'পারিস থেকে তোর একখানা চিঠি ফিরে এসেছে। তোর এ আবার কি পাগ্‌লামি?' বুঝিলাম, তিনি ঐ খোলা চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে পাগল ঠাহরাইয়াছেন। আমাকে তিনি কিসে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছেন এ কথা আমি তাঁহাকে একদিন অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়া ছিলেন, 'আরে না, না, সে রকমের পাগল নয়, তুই একটু বেশী romantic।'

"তুমি বোধ হয় জান না, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন; কেহ তাহা টের পাইত না। তোৎলার প্রধান ঔষধ আস্তে কথা কহা। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে তিনি তোৎলা। সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কখনও ক্লাস পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম তিনি 'উত্তরচরিত' ও 'শকুন্তলা' ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃই তিনি ক্লাস পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজে যখন চাকরি করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক এক জন সিভিলিয়ন ছাত্র লইয়া বাঙ্গালা পড়াইতে হইত। কারণ তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন যে তিনি বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র তাঁহাকে সে বিষয়ে অভয় দান করেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'পুরুষ পরীক্ষা' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলিয়নরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নহে। সেই জন্যই বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থের মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্ব্বে খুব হাস্যপরিহাস চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লেখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার,—বেগবেগা, বেগচিরা, চিরবেগা, চিরচিরা। বেগবেগার অর্থ, যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; বেগচিরা শীঘ্র বুঝে, অনেক দিন মনে রাখে; চিরবেগা বুঝিতে দেরী হয় অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিরা বুঝিতে দেরী হয়, কিন্তু অনেক কাল মনে থাকে। এই চিরচিরা লইয়া লোকে বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ দুখানি একেবারে লুপ্ত হওয়া ভাল নহে; কারণ বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত রীতির পূর্ব্বে কি প্রকার রীতি প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ ডেঁপো পণ্ডিত দিগের মধ্যে, তাহার অতিসুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন; বোধ হয় তাঁহার শয্যাকণ্টক বোধ হইত; তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত 'বেতাল

পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কাল খানি পাইয়া ছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। তাই বাঙ্গালায় অমন সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

"১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদে যান। আমি তখন বোধ হয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ীর উপরে এক হলের ভিতর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের, ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত। ১৮৫০ সাল হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোর করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহিনা। কালক্রমে যাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার 'নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস' গ্রন্থে এই মনোমালিন্যের কারণ সম্বন্ধে নিজে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তখন যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইব না।

"তর্কালঙ্কারের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লেখা মুক্তার মত ঝলমল করিত।

লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লেখা পড়া জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার Librarianএর নামে শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল; সে কবিতার আর কিছুই আমার এখন মনে নাই, কেবল 'লাইব্রেরিয়ান গরীয়ান্' এই দুটি কথা যেন কাণে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধক্ষ্যক লাইব্রেরিকাজে।

'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা পরিবর্ত্তিত হইল। তারাশঙ্কর, তথা বিদ্যাসাগর, খুব অমোদ পাইয়া ছিলেন।

"আবার রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো ঝাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন,

যঃ ঈশ্বরো নিম্নগতঃ করন্তি
সঃ ঈশ্বরো নিজালয়ং নয়ন্তি।

"লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে 'সঙ্কর', খুড়ো ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল; লিখিলেন তালব্য শ, এবং আদর্শ পুঁথিতে স কাটিয়া শ করিয়া দিলেন।

"মদনমোহন চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বীটন মেমোরিয়ালের (Bethune memorial) জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বীটনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু কবে হইল ঠিক আমার মনে পড়ে না; কিন্তু বেশ মনে পড়ে, যে দিন বেথুন কলেজগৃহ খোলা লইল। সংস্কৃত কলেজে আমি তখন মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাই। বিদ্যাসাগর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোদের scholarship থেকে এ মাসে দু'টাকা কেটে নিচ্চি, বীটন মেমোরিয়ালের জন্যে। কি বলিস?' বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন, ব্যাপারটা বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁহার কথার কি প্রতিবাদ করা চলে?

"Law Member ও শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত; সেই সময়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। একবার আমি বিদ্যাভূষণের ক্লাসের পারিতোষিক লইতে টাউন হলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, daisএর উপর অনেক য়ুরোপীয় উপবিষ্ট। নিম্নে আলাহিদা আলাহিদা জায়গায় সংস্কৃত, হিন্দু, কৃষ্ণনগর, হুগলি, ও ঢাকা কলেজের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কাদম্বরী'র অনুবাদক তারাশঙ্কর ও আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের front benchএ উপবিষ্ট। সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর Sir John Littler। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বীটন উপবিষ্ট। স্যর জন বেঁটে ছিলেন, পেটটি মোটা। বীটন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রসন্ন বাবুর

মুখে শুনিয়াছি (কারণ, তখন তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার রসগ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না,) বীটন সভাপতির দিকে ফিরিয়া 'Sir John'—বলিয়া সহসা পূরা নামটি উচ্চারণ না করিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রসন্ন বাবু বলেন যে, বেশ বুঝা গেল, ডেপুটি গবর্ণরের সেই খর্ব্বাকৃতি, বর্ত্তুলোদর মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া Sir John বলিতে গিয়া বীটনের মনে Falstaffএর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া লইয়া শুধু Sir দিয়া বক্তৃতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কলেজগুলি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল; বক্তৃতায় ছেলেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ পরস্পরের প্রতি এই রেষারেষির আবশ্যকতা আছে কি? শিকারের সময় এক প্যাক কুকুর অগ্রসর হইয়া যদি খরগোসটাকে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে অন্য প্যাকগুলির বিশেষ লজ্জার কারণ কি?

"বীটনের নাম করিতে গিয়া কাপ্তেন রিচার্ডসনের নাম স্মৃতি-পথে উদিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলিয়াছি; বীটন তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করেন, তাহাও বোধ হয় তোমাকে বলিয়াছি। চাকরি গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি অধ্যাপনা করিতেন, একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'আপনি surrender at discretionএর ভুল অর্থ গতকল্য ক্লাসে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি কি উহার প্রকৃত অর্থ জানেন না?' কাপ্তেন উত্তর করিলেন—'I

never surrendered at discretion, and therefore, it is possible I do not know what it exactly means'. কেন তাঁহার চাকরি গেল সে কথা তোমাকে প্রকাশ করিতে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন শুনিতেছি, রাজনারায়ণ বাবু কাপ্তেনের চরিত্র-দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বীটন বক্তৃতায় কাহাকে উদ্দেশ করিয়া hoary libertine আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা জানিতে কাহারও বাকি ছিল না। কিন্তু তোমায় বলিয়াছি, কাপ্তেন surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন—There was a man who was *little* and he was *beaten* (বিটন), and there was a man who was *littler* (Sir John Littler) and he was * * । একজন Law Member, লর্ড মেকলে, কাপ্তেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর এক জন Law Member তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।"

১৩

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩১৯।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথার উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহারা তারকের এই দানে বিস্মিত হইবে না।

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। বোধ হয় তারক আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হইবেন। তিনি পড়িতেন হিন্দু কলেজে জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে; আমি পড়িতাম সংস্কৃত কলেজে; আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা ত বড় কিছু ছিল না, কি গতিকে যে হইল তাহা আমার স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে গতিকেই হউক, আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্প বয়সে ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম; অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে

বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিদ্যাসাগর কখনও কখনও লাইব্রেরীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেন আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় রত থাকিয়া ইংরাজীতে পারিপাট্য লাভ করিবার অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্পবয়সে তারক যেরূপ ইংরাজী কহিতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

"সে আজ পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য জন্মে নাই। আমরা 'সখা' শব্দের অর্থ মোটামুটি সহচর বা বন্ধু বুঝিয়া থাকি; কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ স্থলবিশেষে সখা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথা হইতে একটা শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়াছেন 'একপ্রাণঃ সখা প্রোক্তঃ' অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে মিল হইলে সখা হয়। তাহার মানে এই যে, তুমি ও সেক্সপীয়র ভালবাস আমিও সেক্সপীয়র ভালবাসি, তোমারও যাহাতে হাসি পায় আমারও তাহাতে হাসি পায়, তুমিও যাহা ঘৃণা কর আমিও তাহা ঘৃণা করি, এইরূপ নানা প্রকার মিল থাকিলে দুইজনে পরস্পর সখা হয়। তারকের সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মিল আছে; বিশেষতঃ হাসির কথা সম্বন্ধে। আমরা উভয়েই এক্ষণে রুগ্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি; দেখা সাক্ষাৎ বড় কম;

তথাপি এখন পর্য্যন্ত একলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে যদি কোনও হাসির কথা আমার মনে আসে, তৎক্ষণাৎ তারককে মনে হয়; ভাবি যে, সে এ কথাটা শুনিলে খুবই হাসিত।

"তারকের মত বিমল বুদ্ধি আমি খুবই কম দেখিয়াছি। অল্প-বয়স হইতেই তাহার ইংরাজী দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তৎকালে স্যর উইলিয়ম হ্যামিণ্টনের নূতন চলন হইয়াছিল; তারক তাঁহার গ্রন্থ খুব পাঠ করিতেন ও তাঁহার খুব ভক্ত হইয়া-ছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি মিল ও স্পেন্সারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদিও দর্শন শাস্ত্র কতক কতক পড়িতাম বটে, কিন্তু তারকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভূতপূর্ব্ব চক্ষুরুন্মীলন হইয়াছে। একটা বিষয় অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে; আমার একটি বিশেষ অসুস্থতা আছে; সে অসুস্থতাটির বাহিক কোনও লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না; কিন্তু আমি নিজের ভিতরে ভিতরে দুরন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করি। একদিন তারকের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিলাম যে, অনেকে ইহা imaginary (কাল্পনিক) বলিয়া আমাকে উপহাস করেন; তারক কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে বলিলেন, the imaginary is not the less real। এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, এবং তদবধি আমার মানসক্ষেত্রে উহা উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

"ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ

করিতে পারি না; তারকের ইংরাজী গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট, আমার কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজী গদ্যপদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative; চীৎকার, হাতপা নাড়া, ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়ের বহির্ভূত; ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধ হয় তাহাকে serene বলা যাইতে পারে।

তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ আর কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছু মাত্র নাই। এতকালের সংসর্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। একদিনের কথা মনে পড়ে। চা বাগানের এক 'সাহেব' একজন কুলীরমণীর প্রতি এরূপ পাশব বলপ্রয়োগ করে যে, উহাতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। সে সময় সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। Impulseএর বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি অল্পেই চটিয়া উঠেন,

ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। সেরূপ মেজাজ গরম না হইলে বোধ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের দোষই বল আর গুণই বল, কোন রূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; অন্যায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুণ হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকেরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া যায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধু-বান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু বিশেষ দায়ে পড়িলে, পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা একেবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

"বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল

ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'You are the architect of many a man's fortune in town'। কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

"কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমাদের রিপণ কলেজের পুরাতন বাড়ীটির ঠিক পশ্চিম অংশে তারকের মাতামহপ্রদত্ত একখানি একতালা বাড়ী ছিল। কতদিন সেই বাড়ীতে তারকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি; তাহার বসিবার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কত নিভৃত বিশ্রব্ধ আলাপ, কত ভবিষ্যতের আশার কথা, দুইটি অশান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত ব্যাকুল স্পন্দন!

"তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই স্বোপার্জ্জিত, এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহাকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিশ্রমের ধন অম্লানবদনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহানুভাবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

"কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তারক যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্যমে এক-বার মুৎসুদ্দিগিরির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে

তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস্ নামক দুর্দ্ধর্ষ জজের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজী বলিবার পারিপাট্য, straightforwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহার পর তাঁহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চারি বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কার্য্যাভিনিবেশ, অনন্যমনস্কতা, ও অক্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

"তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালা ভাষার এক জন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছু দিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তিনি বলিলেন—

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন; 'অধিকার' শব্দটা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ State function; সেই অর্থ ধরিলে সর্ব্বাধিকারী বলিতে a state functionary who looked after all the departments of a state এইরূপ বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ড রাজ্যের Prime Minister বলিতে যদিও ঠিক তাহা বুঝায় না, তথাপি তিনি প্রধান অমাত্য এই অংশে সর্ব্বাধিকারীর পদের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

"প্রসন্ন বাবু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার কোনও পূর্ব্ব-পুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন; তদবধি তাঁহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে। যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, হাবড়ার সন্নিহিত শিবপুর সহরে একটি মুসলমান বংশ আছে, তাহারা অদ্যাপি 'কাজী' নামে অভিহিত হয়, যদি চ এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাজী পদস্থ নহেন।

"প্রসন্নবাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর

নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। ঐ গ্রামটি হুগলিজিলার অন্তর্গত, এবং এক সময়ে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল; কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের অপরাপর অনেক স্থানের মত ম্যালেরিয়া দোষে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। প্রসন্ন বাবুর কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বোধ হয়; কিন্তু তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকাকড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাত্রিতে পাঠ করিবার জন্য প্রদীপের তৈল পর্য্যন্ত জুটিত না। তিনি রাস্তার লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। আমার মনে আছে, ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রের একটি উত্তর প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন; তাহা আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। সেবার সেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট নামক নাটক পরীক্ষার পুস্তক ছিল, প্রসন্ন বাবু তাহারই উত্তর লিখিয়াছিলেন; এবং তৎসম্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে বিশিষ্ট

ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটীগণিত ও বীজগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটীগণিত প্রসন্ন বাবুর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি। যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মফঃস্বলপ্রদেশে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন,—আন্দাজ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে,—সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নূতন গ্রন্থ শিশুদিগের পাঠোপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশ্যক হইয়া উঠিল। পাটীগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্ন বাবু গ্রহণ করিলেন। এই গুরুতর কার্য্য তিনি কি প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটীগণিত শাস্ত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটীগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অদ্যাবধি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই; কারণ, বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদিগের দেশে সকল কার্য্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকারগণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাঁহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে,

তোর শিল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া,

প্রসন্ন বাবুর পাটীগণিতের পদচ্যুতি ইহারই একটি দৃষ্টান্তস্থল! বাঙ্গালা পাটীগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিয়া প্রসন্ন বাবুকে সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে দুই খণ্ড বহুবিস্তৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহার কারণ, বাঙ্গালাতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন বীজগণিত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং সেই দুই খণ্ড এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্রসম্বন্ধে ভাষার প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম "আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, পাটীগণিত রচনা করিবার সময় প্রসন্ন বাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটীগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না। তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যাপনার প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যাসাগর ইঁহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে, তাঁহার নাম পণ্ডিত

যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোটা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে পবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল।

> কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূরৌ
> নাথুরামো প্রাজ্ঞ বর্জ্জেপ্যনল্পং।
> যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
> টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায়॥

পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথের টীকা সম্বলিত শকুন্তলা প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন —"কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতি কল কব্জা এখানে করাবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।"

এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে জজ পণ্ডিতরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, ঘুষ লইত।

১৪

১২ই চৈত্র ১৩১৯।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সম্প্রতি একটি লোকের মুখে শুনিলাম যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ ধরণের রচনা কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল ; এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকার মহাশয় ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তিনি কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন। বোধ হয়, সংবাদটি এক মুখ হইতে অন্য মুখে কিঞ্চিৎ অন্যথাভূত হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে, এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, উহা রামকমলের। ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি

করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

"বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম। তুমি হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যা-চরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

"কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকা-খানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল;

নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছিলাম—তাহার নাম 'উজ্জ্বল'। চিঠিপত্রের প্রণালীতে লেখা। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ আমি ইহা মুদ্রিত হইতে দিই নাই। এমন কি, সমস্ত টাইপযোজনা হইয়াছিল; আমি বিহারী-লালের অজ্ঞাতে সেই টাইপযোজনা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসি। ঐ রচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলাল উহা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যখন শুনিলেন যে, আমি গল্পটি চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তখন তিনি আমাকে কেবল মারিতে বাকী রাখিয়াছিলেন।

"ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকটি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers এর অনুকরণে যে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ তুমি পূর্ব্বেই একটি প্রসঙ্গে কতকটা লিপিবদ্ধ করিয়াছ। এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'বিচিত্রবীর্য্য' নামক একখানি গ্রন্থ ও একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস রচনা করিয়া-ছিলাম। 'বিচিত্রবীর্য্য' হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিয়াছিলেন,—"It would do credit to a

veteran writer",—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

"কখনও গ্রন্থকার বা লেখক হইবার সাধ আমার বড় একটা তীব্র ছিল না। এক্ষণে কেহ কেহ আমার লেখার বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে আমি এই বিবরণটি সঙ্কলন করিলাম। লেখাগুলি একত্র মুদ্রিত করিলে বাঙ্গালা ভাষার, কি আমার নিজের, কোনও উপকার হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে আমি এত প্রাচীন ও অথর্ব্ব হইয়াছি যে, নিজে তদ্বিষয়ে কোনও সাহায্য করিতে পারি বোধ হয় না; কিন্তু যদি সংগ্রহ হয় এবং ছাপাইবার আয়োজন হয়, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক সাহিত্যে লিখিবার অবসর বড় একটা ছিল না। বোধ হয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে এবং বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতি কোনও পত্রিকায় কখনও লেখেন নাই।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীতে পাণিনি ব্যাকরণ

ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণই তাঁহার specialty (বৈশিষ্ট) ছিল, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্দেশে দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি মুগ্ধবোধ-ব্যবসায়ীদিগকে তিনি বড়ই অবজ্ঞা করিতেন; কিন্তু মুগ্ধবোধ ও বোপদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মতে পাণিনি না জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা হইতেই পারে না। ব্যাকরণসম্বন্ধে 'শব্দার্ণবরত্ন' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে কি না এবং অদ্যাপি ঐ গ্রন্থের অনুশীলন হয় কি না, বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, উহাতে বাক্যপদীয় অথবা হরিকারিকা নামক অত্যুৎকৃষ্ট ভর্ত্তৃ-হরি-প্রণীত গ্রন্থের সারাংশসকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় একখানি সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক। ইহাতে যে কি প্রকার কল্পনাচাতুর্য্য (speculative ingenuity) প্রদর্শিত হই-য়াছে, তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থখানি আমি যে ভালরূপ জানি, এ অভিমান আমার নাই; অতি যৎসামান্য আভাস পাইয়াছি মাত্র। তাহাতেই আমার উহার প্রতি এতটা শ্রদ্ধার ও ভক্তির উদয় হই-য়াছে। তারানাথ বোধ হয়, ঐ গ্রন্থখানি ভালরূপ অনুশীলন করিয়া-ছিলেন। আমার মনে হয় যে গোল্‌ড্‌ষ্টুকার পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও বাক্যপদীয় ভালরূপ দেখেন নাই। বাক্যপদীয় পদ্যে লিখিত; উহার অনেকগুলি কারিকা এখনও আমার মুখস্থ আছে। একটিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নের মীমাংসা আছে;—যদি কোনও একটা

জিনিষ হইতে আর পাঁচটা জিনিষ প্রস্তুত হয়, তবে সেই বিষয়ের সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে গেলে ক্রিয়াতে কোন্ বচন দিতে হইবে, একবচন না বহুবচন? যেমন মনে কর, একটা বৃক্ষ হইতে পাঁচ খানা নৌকা প্রস্তুত হইতেছে; এখন এখানে কিরূপ বাক্য রচনা করিবে? "একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি" বলিবে না "ভবন্তি" বলিবে? আমার যেন মনে আছে "ভবন্তি"। কিন্তু যে হরি কারিকাটি মুখস্থ আছে, সেটি তদ্বিপরীত। কারিকাটি এই—

"প্রকৃতের্বিকৃতের্বাপি যত্রোক্তত্বং দ্বয়োরপি।
বাচকঃ প্রকৃতেঃ সংখ্যাং গৃহ্লাতি বিকৃতের্ন তু॥"

অর্থাৎ, যে জিনিসটা হইতে তৈয়ারি হয়, আর যেটা তৈয়ারি হয়, দুইটাই যে স্থলে উল্লিখিত হইতেছে, সে স্থলে ক্রিয়াতে প্রথমটার যে বচন, সেই বচনই দিতে হইবে, দ্বিতীয়টার বচন দিতে হইবে না। তদনুসারে

একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি

এইরূপ বলিতে হয়। এ বিষয়ের মীমাংসা আমি ত এখন কিছুই দিতে পারি না; তর্কবাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিতেন। আর একটা প্রশ্ন আছে। পাণিনি অপাদান কারক define করিতে গিয়া লিখিয়াছেন

"ধ্রুবমপায়ে অপাদানং"

অর্থাৎ দুইটা বস্তু পরস্পর পৃথক্ হইবার স্থলে যেটা স্থির থাকে, সেইটা অপাদান। যেমন বৃক্ষাৎ পত্রং পততি; অর্থাৎ পাতাটাই সরিয়া গেল, বৃক্ষ স্থিরই আছে; সুতরাং বৃক্ষই অপাদান। কিন্তু

পাণিনিকৃত এই definition এর উপর ফাঁকি উঠিল; ধাবতো অশ্বাৎ পততি, ঘোড়া দৌড়িতেছে, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে সওয়ার পড়িয়া গেল; এ স্থলে অশ্ব ত স্থির নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সওয়ারের পক্ষে অশ্ব কি অপাদান হইবে না? প্লেটো কোনও এক সময়ে মানুষকে define করিয়াছিলেন a biped without wings ডানাবিহীন দ্বিপদ; তাহাতে কোনও এক ব্যক্তি একটা মোরগের দুই ডানা কাটিয়া হাটের মাঝে টাঙ্গাইয়া দিয়া তলায় লিখিয়া রাখিল,—এই দেখ, প্লেটোর মানুষ! পাণিনির অপাদানবিষয়েও পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির (difficulty) কি প্রকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না।

"এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, হরিকারিকাতে কি প্রকার বিষয়ের আন্দোলন করা হইয়াছে। আর একটি কারিকা শুন; বোধ হয়, এটিও হরিকারিকা হইবে। কারিকাটি এই—

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোস্পদে॥

অর্থাৎ, মাহেশ নামে এক ব্যাকরণ আছে, সমুদ্রতুল্য; পাণিনি তাহার নিকট গোস্পদতুল্য; ব্যাসের প্রণীত পুরাণাদিতে যে সকল পদ আমরা আর্ষ বলিয়া থাকি, সেগুলি মাহেশ ব্যাকরণ হইতে পাওয়া যায়, অতি ক্ষুদ্র পাণিনিতে কোথায় পাইবে? মাহেশ ব্যাকরণ অদ্যাপি আছে, কি লুপ্ত হইয়াছে, জানি না; কিন্তু যদি

থাকে, সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের অনুসন্ধান করা উচিত। তর্কবাচস্পতি মহাশয় জীবিত থাকিলে ইহার কোনও না কোনও সংবাদ পাওয়া যাইত।

"আমি তাঁহার নিকট সংস্কৃত কলেজে ভট্টি ও অভিধান পড়িয়াছি। তাঁহার শ্রেণী প্রথম শ্রেণী বলিয়া অভিহিত ছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোবিন্দ গোস্বামী ও প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করি; গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে এক বৎসর থাকিয়া ধাতুপ্রকরণ শেষ করি; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের অবশিষ্টাংশ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পূজ্যপাদ তারানাথের ছাত্র হই। এই সময়ে মতিলাল নামে আমার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি মুগ্ধবোধের কূট কথা লইয়া খুব নাড়চাড়া করিতেন। মুগ্ধবোধের বিষয়ে একটা প্রবাদ আছে যে, বোপদেব সূত্রগুলি যতদূর পারেন, অল্পাক্ষর করিয়া গিয়াছেন; কাহারও সাধ্য নাই, কোনও একটি সূত্রের একটিও অক্ষর কমাইয়া গঠন করিতে পারেন। যদি কেহ ভাবেন, তিনি অক্ষর কমাইতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, কোথাও না কোথাও ঠেকিয়া যাইবেন। মতিলাল প্রত্যহ এক একটি ঐ প্রকারের ফাঁকি আনিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কখনও এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন চিন্তা করিয়া সামাধা করিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহাকে বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইত। কিন্তু তিনি

বোপদেবকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার মানরক্ষার জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

"সংস্কৃত syntax এর (শব্দযোজনারীতির) উপর 'বাক্যমঞ্জরী' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতবিদ্যার্থীদিগের উহা পাঠ করা উচিত।

"শুধু ব্যাকরণ নহে, তারানাথ স্মৃতি ও জ্যোতিষ ভালরূপ জানিতেন। বাচস্পত্য অভিধানে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি প্রয়োগগ্রন্থ (rituals) লিখিয়া গিয়াছেন—'তুলাদানপদ্ধতি' ও 'গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি'। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পুস্তক দুইখানির লোপ হওয়া উচিত নহে; ঐ ঐ বিষয়ের তাবৎ বিবরণ ঐ দুই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

"বাচস্পত্য অভিধান প্রথমে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও আমি, এই তিন জনে প্রস্তুত করিব বলিয়া কথা হয়, বোধ হয় ১৮৬৫-৬৬ সালে; কিন্তু কার্য্যকালে ন্যায়রত্ন ও আমি সরিয়া পড়িলাম। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সঙ্কল্পিত কার্য্য ত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা সাহায্য পাইলেন। ইনস্পেক্টর উড্রো 'সাহেব' আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, সে কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি; তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অর্থসাহায্য করেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে আমি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলাম। মহামতি উড্রো সাহেব, তারানাথের অদ্বিতীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয়

পাইয়া উক্ত সাহায্য ঘটাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় একাকী ঐ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; দশ বৎসরের অধিক কাল পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। আমার বিশ্বাস, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারাই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের তাঁহার ন্যায় কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

"আমাদের দেশের লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের, যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, অর্থাৎ Versatility'র অভাব, তারানাথের তাহা ছিল না। এত শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করিতেন। কখনও বা শালের কারবার, কখনও বা নিজ গ্রাম অম্বিকাকালনায় সুরকি প্রস্তুত করিবার কারবারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে একটি হাসির কথা মনে পড়ে। এক দিন এক সভায় বিচার করিতে করিতে তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রৌঢ়িপূর্ব্বক (with haughty assurance) বলিয়া উঠিলেন—'এ কথা যদি না হয় ত আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।' প্রতিদ্বন্দ্বী তৎক্ষণাৎ পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কোন্ ব্যবসা মশাই? শালের ব্যবসা, না শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবসা?

"পরিশেষে তিনি অর্থোপার্জ্জনের সঙ্কল্প কতকটা সিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ নিজকৃত টীকা সহিত মুদ্রিত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জীবানন্দও সেই কার্য্য চালাইয়া যে বিশেষরূপ সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহের অবৈধতার বিষয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ করেন, সে সময়ে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রথমে তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে উদ্যত ছিলেন। বহুবিবাহ যে অবৈধ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর একটি সুপরিচিত মনুবচনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সে বচনটি এই—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীণাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রাণাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥"

পূর্ব্বে এই শ্লোকের মোটামুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য; পরে ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে স্বজাতীয়া বা ভিন্নজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সূক্ষ্মবিবেচনা প্রয়োগ পূর্ব্বক মনুবচনদ্বয়ের এইরূপ অর্থ স্থির করিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্বজাতীয়া পত্নী হইতেই পারে না, ভিন্নজাতীয়া পত্নী চাহি। কিন্তু মনু প্রতিলোম-বিবাহের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন; অতএব তিনি অনুলোমরীতিতেই ভিন্নজাতীয়া পত্নীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিবাহসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি এই ছিল যে, যখন মনুর মতে কাম্যবিবাহ ভিন্নজাতীয়া কন্যা ব্যতীত হইতেই

পারে না, এবং যখন কলিতে জাত্যন্তরবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, তখন কলিতে বহুবিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা বিলক্ষণ সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ প্রণিধানের সহিত বচন দুইটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমারও অনেক সময়ে বোধ হয় যে, মনুর অভিপ্রায় বা ইহাই ছিল। তবে একটা গোল এই থাকে যে, শূদ্রের পক্ষে কি কাম্যবিবাহ ঘটিবে না ? কারণ শূদ্রের চেয়ে ছোট জাতি আর নাই ; এবং মনুর মতে কাম্যবিবাহ আপন অপেক্ষা ছোট জাতির কন্যার সহিতই শাস্ত্রানুমোদিত। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি, তারানাথ তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমাদের ঢিপ্‌লে না হোলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার কর্‌তে পারে ?' বিদ্যাসাগরের গ্যাটা গোঁটা খর্ব্বাকৃতি দেহ ছিল ; এই জন্য তারানাথ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আদর করিয়া তাঁহাকে 'ঢিপ্‌লে' বলিয়া ডাকিতেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে এই আদরের ডাকনাম আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহবিষয়ক প্রস্তাব মুদ্রিত হইল। কিছুদিন পরে দেখিলাম তারানাথ উহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিলেন। অগত্যা বিদ্যাসাগর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তারানাথের যে প্রকার সর্ব্বসংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহাতে কোনও

একটি সিদ্ধান্তে স্থায়িভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। দুই প্রকারের যুক্তিই তাঁহার চক্ষুর উপরে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত। সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিদ্যমান থাকে। কেবল Positive Science অর্থাৎ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উল্টাইবার জো নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে; পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বত্রিশ ফুট; ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে; এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে পাগলামি করা হয় মাত্র। নতুবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না; কলিতে ভিন্নজাতীয় বিবাহ হইতে পারে কি না; ক্ষত্রিয় জাতি অদ্যাপি আছে, কি লোপ পাইয়াছে, এ সকল বিষয়ে মতামত চিরকালই আছে ও থাকিবে। তারানাথ যদিও প্রথমে বহুবিবাহের অবৈধতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার বোধ হয়, কোনও ব্যক্তির অনুরোধে তদ্বিরুদ্ধমত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, যদিও তিনি বিধবাবিবাহে মত দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে, সে মতের বিপরীতে বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে।

"বিদ্যাসাগরের প্রবল যুক্তিতে কাহারও মন আর্দ্র হইল না। যাঁহারা য়ুরোপীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিবাহবিদ্বেষী হইতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন

করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বহুবিবাহনিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র (Permissive—not coercive)। আইন বিধবাকে বলিতেছে—'ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর; না হয়, না কর; কিন্তু যদি কর, তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয়; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বিফল হইল।

"কিন্তু একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহুবিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস,' 'রত্ন-পরীক্ষা,' 'কস্যচিত ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজের যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র

উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রের কথা বড় একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহারা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবার সময়ই তাঁহাদিগের নাই। সুতরাং এ দেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের এক-প্রকার কচুবনে মুক্তাছড়ান হইয়াছে; যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যা-সাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তার জন্য যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর এ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কারণ, তিনি বাঙ্গালা ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ পড়ুক আর না পড়ুক, আনন্দ করুক আর না করুক, বাঙ্গালা লিখিতে তাঁহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

"বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে

বোধ হয়, বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার কিছু কিছু সময়ে সময়ে মনে পড়ে। বীটন কলেজ বরাবরই কোনও না কোনও কমিটীর শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে বিদ্যাসাগর সেক্রেটরি ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ 'সাহেব' কমিটীর মেম্বর ছিলেন। একটি ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানি না, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল; তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটীকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি; তদন্ত করিবার ভার তাঁহাকেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষই নাই। পরে এই বিষয়ের বিচারের জন্য একদিন কমিটীর বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর সকলকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতটি নিরপরাধ। কিন্তু কমিটীর মেম্বর অধিকাংশ য়ুরোপীয়; প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিঙ্গী; কমিটী ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, 'তবে না হয়, দু' এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে suspend করা যাক্; কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বল ?" বিদ্যাসাগর গত্যন্তর না দেখিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her. "আচ্ছা, তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে, কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না।

ইংরাজরা আর যাহাই হৌক, প্রকৃত রসিকতা (Wit) পাইলে গুণগ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন। এক-বার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল ; বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— 'ওহে, আজকে political world এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন ; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, 'যাও, আর উস্‌খুস্‌ কোর্‌চ কেন? বাড়ীর ভেতরেই যাও।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শ্বশুরবাড়ী যাইতেন ; এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতেন। বিদ্যাসাগর এক দিন একত্রে দু'জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হিমা-লয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ'।

১৫

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিদ্যাসাগরের একটা চিরকালের অভ্যাস ছিল যে প্রায় ছোকরা দলের সকলকেই তিনি কখনও 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলিতে পারিতেন না। তিনি আমাকে যে 'তুই' বলিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি যখন ৬।৭ বৎসর বয়সে কেবল আব্দার করিয়া আমার দাদার সঙ্গে কলেজে যাইতাম, প্রত্যহ তাঁহাদের ক্লাসের ঘরের এক পাশে সমস্ত দিন বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিয়া বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিতাম, তখন বিদ্যাসাগর এক দিন (তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) আমাকে লইয়া নিম্নতম শ্রেণীতে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের ঘরে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই অবধি প্রায় আমার চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও 'তুই' ব্যতীত 'তুমি' সম্বোধন পাই নাই। ইহা যে কখনও আমার মন্দ লাগিয়াছিল এমন কথা আমি বলি না; আমি বরং ভাবিতাম যে, তিনি যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমাকে যে স্নেহ করেন, 'তুই' সম্বোধন তাহারই পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম যে ইহা সকলের ভাল লাগিত না। সংস্কৃত কলেজের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন; তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র

গুপ্ত *। বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা তিনি অনেক junior ছিলেন; এক দিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন 'তুই বলিতে যতক্ষণ, তুমি বলিতেও ততক্ষণ; তবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বসেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমুখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।' উমেশ গুপ্ত এই কথা বিরক্তির ভাবেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই বোধ হয় যে, এই অভ্যাসটি বিদ্যাসাগরের সারল্যগুণের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোকদেখান বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেটা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলে বেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। বিধবাবিবাহের গল্প করিতে বসিয়া এক দিন তিনি বলিলেন,—যখন আমি বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আপনার মত স্থির করিয়া বসিয়াছি, তখন ভাবিলাম যে, মা'কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না, তিনি কি বলেন? আমাকে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন, কি মানা করেন? এই অভিপ্রায়ে এক

*কবিরাজ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন "অশ্ববৈদ্যক" নামক গ্রন্থ টীকা করিয়া edit করেন, ও "রসেন্দ্র চিন্তামণি" "গৌরীকাঞ্চনিকাতন্ত্র" "কথাসরিৎসাগর" প্রভৃতি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

দিন তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম 'মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব (আমি মাকে চিরকালই 'তুই' বলে ডাকি ; ছেলে বেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি) আমি ত বিধবাবিবাহ চালাব স্থির করেছি, এতে তোর মত কি ?' মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে ? আমি বলিলাম, হাঁ আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তুই চালাগে যা, আমার তা'তে অমত নেই।

"এখনকার দিনে আমি দেখিতেছি যে, পুত্র একটু বড় হইলে এবং রোজগারি হইলে, পিতা তাহাকে 'তুই' বলা দূরে থাকুক, পরোক্ষে 'তিনি' বলিয়া থাকেন। আমি অনেক পিতার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি ; এবং আমার এটা যেন কেমন কেমন লাগে। কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, বাল্যকালেও পিতা পুত্রকে 'তুমি' বৈ 'তুই' বলেন না ; পুত্রও পিতাকে শৈশবাবস্থা হইতে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিতে অভ্যাস করে। ইহার একটা মানেও আছে। সেই সকল পরিবারের কর্ত্তারা বিবেচনা করেন যে, সভ্যতার সমুদাচার (কথা-বার্ত্তা আদবকায়দা ইত্যাদি) শিক্ষা করা বালকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, এবং খুব অল্প বয়সেই অভ্যাস করা ভাল।

"বিদ্যাসাগর যে সকল ছোকরাকেই 'তুই' বলিতেন, আমি এমন কথা বলিতে চাহি না। আমার মনে হয় না যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' কখনও বলিয়া-

ছিলেন। কিন্তু আমার নিজের কথা আমি জানি; রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা জানি; ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথাও জানি। কলিকাতায় একবার হোসেন খাঁ নামক বাজীকরের দিনকতক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সূর্য্যবাবু তাহার দু'চারিটা ভেল্কি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এক দিন বিদ্যাসাগরের কাছে গল্প করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আরে আমি তোর কথা শুনিনে। তোকে আমি জানি, তুই কতকটা আহ্লাদে। আমি আমার হাতে আংটি মুঠো করে ধরে থাকি; যদি আমার হাত থেকে হোসেন খাঁ আংটি উড়িয়ে দিতে পারে, তা হোলে বুঝব যে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।' শ্রীমান্ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরের দেওয়ানী করিয়া মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখনও বিদ্যাসাগরের কাছে সেই সাবেক 'তুই' সম্বোধন পাইলেন, ভুলেও একবার 'তুমি' নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্রসন্নকুমার রায় (মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম হেডমাষ্টার) ইঁহাদের কাহাকেও কখনও তিনি 'তুই' বলেন নাই। অথচ প্রসন্ন বাবুর দুই এক বৎসরের ছোট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সূর্য্যবাবুকে তিনি 'তুই' বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি যে কি পার্থক্যের নিয়ম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। ইদানীন্তন বালক দিগের মধ্যে তাঁহার অপরিচিত একটি এম, এ. চাকরীর প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গিয়াছিল। ছোকরাটি থিয়সফিষ্ট; লম্বা চুল রাখিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাকে দেখিয়া

কহিলেন, 'আরে তোকে মাষ্টারি কর্ম্ম দোবো কি! তুই মেয়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।' এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তিনি কাহাকেও বা 'তুমি' কাহাকেও বা 'তুই' বলিতেন।

"শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কায নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও কোনও বিধবাবিবাহ-দ্বেষী তার্কিক তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক বেশী; যদি বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে; সেটা কি মঙ্গলকর? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন,—'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'

"এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসভ্যজাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কর্ম্মটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল

জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমী খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমী আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসহরদ্দ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমূল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল, "কিন্তু ঐ গাছটি বটে," বলিয়া আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদাসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।

"আমার এই পুরাতন প্রসঙ্গের মধ্যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ; কিন্তু যখন তিনি তাঁহার মেছোবাজার ষ্ট্রীটের ছোট একতালা বাসাবাড়ীর একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শুনাইতেন, তখন আমার অন্তরে যে পুলক সঞ্চারিত হইত, তাহার ক্ষীণ আভাসটুকুও বোধ হয় তোমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিবে

না। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি; বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন; আসবাব-বিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন; কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম; বলিলাম, 'শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে এক ডিনার-পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ নাই, সেখানে আমি যাই কি করিয়া?' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তাই ত; এটা বেশ বিবেচনার কাজ হয় নি। আমিও আর নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেলাম না। এম্নিতর কত ছোট বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তাম্রকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; সট্‌কা নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নস্যও লইতেন; তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু নস্য কিংবা তামাক কিছুই সেবন করিতেন না।

"বিদ্যাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থার কত গল্পই করিতেন। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই

তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধো কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ। তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

"দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান

করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

"সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

"অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ দেখিয়াছি। তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা॥

তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।

"ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। বায়রণের 'চাইল্‌ড্‌ হ্যারল্ড' পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন ভাবোন্মত্ত হইতাম যে, আহা, হা, করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত।

"বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়ীটিতে ত ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল; বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না; সন্নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমরা বিছানায় উপবেশন করিতাম। বিদ্যাসাগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব বহুকালস্থায়ী। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ি বৌবাজারে ছিল; তাহারই সন্নিকটে বিদ্যাসাগর বাসা করিয়াছিলেন; ক্রমে বিদ্যাসাগর নিজের বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজের বাসায় কিন্তু তাঁহারই আত্মীয় দশ-বার জন লোক সদাসর্ব্বদা থাকিত; তিনি তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যয়ভার বরাবর বহন করিতেন। পরে বিদ্যাসাগর যখন মেছোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বৌবাজারে

তাঁহার এই বাসা ছিল; তাঁহার গ্রামের লোক আসা যাওয়া করিত, এবং সেইখানেই থাকিত। যখন তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখনও তাঁহার বৌবাজারের বাসা ছিল।

"বিদ্যাসাগরের চটিজুতার কথা শুনিয়াছ, তিনি চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পায়ে দিতেন না; তাঁহাকে কখনও খড়ম পায়ে দিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; কখনও কখনও তিনি সখ করিয়া তালতলার চটি বিলাতি বার্ণিশের মত ঝক্‌ঝকে কালো করিয়া বুরুষ করাইয়া লইতেন; এই চটিজুতা পায়ে দিয়া তিনি খুব হাঁটিতে পারিতেন।

"দেখ, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেশী দূর হাঁটিতে হইলে চটিজুতা পরাই ভাল, পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে না। আমি কিন্তু তাহা পারিতাম না। প্রেসি-ডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আমি একবার গ্রীষ্মাবকাশে পদব্রজে হাবড়া হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্ন বাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম। শুধুপায়ে পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম; চটিজুতা হাতে ছিল! সেখানকার জল হাওয়া তখন খুব ভাল ছিল। সেবার বন্যায় নিকটবর্ত্তী তিন চারিটা গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছিল; আমার অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিশীথে যখন গ্রাম সুপ্ত, প্রসন্ন বাবুর কোনও সাড়াশব্দ নাই, আমি নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদী অভিমুখে চলিলাম; নদীর কূল কিনারা দেখা যায় না। সেই

জলরাশির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য মন আকুল। জলের ভিতর দিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বটগাছের উপর উঠিলাম। নীচে চাহিয়া দেখি, গ্রামের কয়েকজন লোক আমাকে অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছে; তাহারা আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে বারম্বার অনুনয় করিল; তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না; বৃক্ষশাখা হইতে জলরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িলাম। এপার ওপার সন্তরণ করিয়া আমার ক্লান্তিবোধ হইল না। বিদ্যাসাগরের দামোদর নদীবক্ষে সন্তরণের কথায় বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Act এ তেই বিদ্যাসাগরের নাম আছে, কিন্তু তিনি যে কখনও সেনেটের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন তাহা ত আমার স্মরণ হয় না। অবশ্যই ১৮৭২ সালের পূর্ব্বের কথা আমি ঠিক জানি না; ঐ বৎসর হইতে আমি সেনেটের মেম্বর হইয়া আসিতেছি। ধুতি ও চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পরিধান করিতেন না বলিয়া যে তিনি সেনেটে যাইতেন না, এমন আমার মনে হয় না।

"বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন; ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধনপথে

অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "হাঁ রে, ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?" ললিত উত্তর দিতেন, "আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কা'র?" বিদ্যাসাগর হাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরব্ধ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reasonএর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাববন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"আমার এই পূর্ব্বস্মৃতিবিবৃতি করিতে বসিয়া যাঁহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন; আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারিলাল, জজ দ্বারকানাথ। আমার দাদা সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; 'কুসুমাঞ্জলি' ও হব্‌স্‌, দুইই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। 'কুসুমাঞ্জলির' এত খ্যাতি ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল 'সাহেব'

গ্রন্থখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্য-সম্বন্ধে 'সাহেব' তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, Udayanacharya is a fixed star of which neither the distance nor the dimensions can be ascertained, তিনি কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাহার কাছে অধ্যয়ন করিলেন, ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। সেই গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক syllogism,—ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ অর্থাৎ the five elements earth, water, etc. must have had some author or creator, because they are the result of some activity (কার্য্য) like all artificial objects। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

"আমি Positivist; আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসঙ্গ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—'কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight, and he can slight all things divine.'

পরিশিষ্ট

আলোচনা।

আজ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম "আমার গোটা দুই কথা নিবেদন করিবার আছে, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।

"প্রথম কথা,—'নিষ্ক' শব্দের কনিষ্ক হইতে উৎপত্তি * সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে এই গাথাটি আমাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

'দেশাদ্দেশাৎ সমোঢ়ানাঃ সর্ব্বাসামাঢ্যদুহিতৃণাং।
দশাদদাৎ সহস্রাণ্যাত্রেয়ো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ॥'

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী নিম্নলিখিত শ্লোকটি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন--

'শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥'

(মহাভারত। বনপর্ব্ব, ২৩২।৪৬)

"দ্বিতীয় কথা, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আলোচনাটা যেরূপ দাঁড়াইল তাহা আপনাকে শুনাইতে চাহি। সে দিন রামেন্দ্র বাবুর মত আপনাকে শুনাইয়াছি; আপনার বক্তব্যটুকুও রামেন্দ্রবাবুকে

---

* ১১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুনাইয়াছি; তাঁহার শেষ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। এখন কি দাঁড়াইল শুনুন।

"রামেন্দ্রবাবু বলেন, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে তিন রকম tradition আছে। (১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের,—পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেকের মধ্যে এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক ব্যবধান; এই হিসাবের ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বৎসর দাঁড়ায় (round numbers দেওয়া গেল, দু'শ' এক'শ' বৎসর ধর্ত্তব্য নহে)। (২) শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব। এই হিসাবে যুধিষ্ঠিরের সময় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের কিছু বেশী দাঁড়ায় (কলি ৫০০০ বৎসরের কিছু উপর, এখন খৃষ্টাব্দ ১৯১১, বাদ আন্দাজ ৩১০০)। (৩) কলির আরম্ভের আন্দাজ পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে। বোধ হয় এইটি বরাহমিহিরের theory, বৃহৎসংহিতায় দেখিয়াছি। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর দাঁড়ায়।

"বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইত। তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে, সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে Vernal Equinox মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত, এবং সেই সময়ে বৎসরারম্ভ হইত। আজকাল পঞ্জিকায় অশ্বিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বৎসরারম্ভ হয়। পঞ্জিকায় ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন মহাবিষুব সংক্রান্তি লিখে, কিন্তু আজকাল বিষুবসংক্রমণ

তাহার ২১ দিন পূর্ব্বে, ৯ই চৈত্র হয়। ঐ বিষুবসংক্রমণের দিনই দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। পঞ্জিকাগণনার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে বিষুবসংক্রমণ হইত, এবং ১লা বৈশাখ বৎসরারম্ভের এবং অশ্বিনীকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র গ্রহণের সার্থকতা ছিল। প্রায় বায়াত্তর বৎসরে বিষুবসংক্রমণ একদিন করিয়া পিছাইয়া আইসে। এইরূপে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ২১ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। পঞ্জিকার যদি আর সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শীতকালে দিন রাত্রি সমান হইবে।

"এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিককালে সূর্য্য কৃত্তিকানক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ এবং বৎসরারম্ভ হইত। নক্ষত্রচক্রের এক এক নক্ষত্র তের ডিগ্রির কিছু অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে। সেই নক্ষত্রের আদি, মধ্য, অন্ত, কোন্ খানে বিষুবসংক্রমণ ঘটিত তাহা না জানিলে সূক্ষ্মরূপ কালনির্দ্দেশ চলিতে পারে না। কেন না বিষুবসংক্রমন এই সমস্ত স্থানটা পার হইতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার Orion নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। মন্ত্রযুগের শেষ এবং ব্রাহ্মণযুগের আরম্ভ খ্রীষ্টের ২৫০০ বৎসর অথবা আরও কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তিনি এই মতেরই পক্ষপাতী।

"যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া বনে যাওয়ায় শান্তনু রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। ঋগ্বেদ সংহিতার

দশম মণ্ডলে একটি সূক্তের ঋষি দেবাপি। ঐ সূক্তে শান্তনুর নাম আছে। বেদের শন্তনু মহাভারতের শান্তনু। শান্তনুর রাজত্ব-কালে অনাবৃষ্টি ঘটায় দেবাপি আসিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ সূক্ত সেই উপলক্ষে দেবাপিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এই উপাখ্যান আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠির বেদের মন্ত্রযুগের শেষকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

"অন্যদিক হইতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। বশিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র শক্তি, এবং পৌত্র পরাশর, ঋগ্বেদসংহিতার বহু মন্ত্রের ঋষি। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সেরূপ প্রসিদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনি বেদের সঙ্কলন ও বিভাগদ্বারা বেদব্যাস আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী এবং মহাভারতের রচনাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রযুগের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে উল্লিখিত গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বা তাহার কিছু পূর্ব্বকালকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"বৈদিকযুগের কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত এরূপ প্রমাণ বেদের মধ্যেই আছে। বিষুবসংক্রমণের কাল ক্রমশঃ সরিয়া যাওয়ায় কৃত্তিকা এখন ঠিক পূর্ব্বে উদিত না হইয়া একটু উত্তর-পূর্ব্বে উদিত হয়। এই উদয়স্থান কতটুকু সরিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়াও বেদের কালনিরূপণের কতকটা সাহায্য হয়। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

"তাহারপর 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ' এই উক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন 'কৃষ্ণকমলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। মঘা ও সপ্তর্ষি Fixed Stars তাহাদের relative positions বদলায় না। এই জন্য আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ কথাটার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। তদ্ব্যতীত ঐ বচনের সঙ্গে যে ধরা হয় যে মুনিগণ এক এক নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া থাকেন, ইহারও কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠিরের সময় মুনিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন; তাহার পর ক্রমশঃ একশ' বৎসরে এক এক নক্ষত্র সরিয়া গিয়া এখন অন্যত্র উপস্থিত হইয়াছেন, এই জ্যোতিষ-বাক্য অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কালগণনার চেষ্টা নিষ্ফল; কেন না, ঐ জ্যোতিষবাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থই পাওয়া যায় না। তবে আমি একটা মানে দিতে পারি। আমার ব্যাখ্যা এই :—

The Ecliptic is a fixed circle in the celestial sphere, and it makes the plane of the earth's orbit round the sun. Its axis passes through a fixed point on the celestial sphere which is called the Pole of the Ecliptic. The earth's equator does not lie in the plane of the ecliptic, but is inclined to it by about twenty three and a half degrees; so the earth's axis of rotation, instead of passing through the Pole of the Ecliptic, passes through another point in the celestial sphere which is twenty three and a half degrees distant from the Pole of the Ecliptic. This latter point is called the Pole of the Equator.

This point however, is not fixed. It revolves round the fixed Pole of the Ecliptic once in about 26000 years. What is called the Precession of the Equinox is a consequence of this motion of revolution of one Pole round the other. The solstitial colure is a line joining the two poles, one of which is thus fixed and the other moving. This line, therefore, makes a similar revolution round the fixed pole of the Ecliptic ; and the end of the line where it cuts the Ecliptic moves along the Ecliptic once in 26000 years.

The lunar asterisms, which are twenty seven in number, are star-groups roughly distributed along the Ecliptic ; and as the solstitial colure revolves, it passes from asterism to asterism, crossing each asterism in 26000/27 or roughly 1000 years. At present the colure passes through the asterism Ardra ; but between 2500 B. C. and 1500 B. C. it passed through the asterism Magha.

Now, if a line be drawn from the Pole of the Ecliptic to a point in the asterism Magha, this line will be found to pass through the constellation Great Bear. which is the same as the constellation of seven Rishis ; and if we will call this the Rishi line, it will be readily seen that this Rishi line was very close to, and at times almost identical with the

solstitial colure between the years 2500 B. C. and 1500 B. C. During the period the colure passed through the Rishis and through the asterism Magha as well. The only rational interpretation that can be given to the text আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ যুধিষ্ঠিরে শাসতি পৃথ্বীং is that when Judisthira lived, the solstitial colure passed through the constellation of Rishis and the asterism Magha. In that case Judisthira lived sometime between 2500 B C and 1500 B. C.

"The Rishis form a fixed grout of stars in the heavens, and they can have no motion relative either to the Pole of the Ecliptic or to the lunar asterisms which are also fixed. It is the line of the colure and not the Rishi line that moves across the asterisms. But the two lines were coincident in some past epoch ; and by a confusion of thought what was really a motion of the colure was taken to be a motion of the Rishis themselves. Even so the duration of motion througe an asterism would be about a thousand years, and not a hundred years only, as is assumed in the sanskrit astronomical texts.

অর্থাৎ এক হাজারে কোনও রূপে শূন্য ভুল হইয়া একশতে দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হয়। মুনিগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষি

নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন, এবং যুধিষ্ঠিরের সময় তাঁহারা মঘানক্ষত্রে ছিলেন; এখন সরিয়া অন্য নক্ষত্রে আসিয়াছেন, এই যে প্রচলিত জ্যোতিষ বচন, ইহার অন্য কোনও রূপ সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না।”

নাকে খৎ।

—:*:)—

ইহা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। ইহার ইতিহাস-সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন,ঃ—,

হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোট খানি লইয়া হেম বাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিষ্ঠেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।	আমি
ধনুদ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর'	... যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধুম্‌খালি'	... উমাকালী
চাঁদকবি	... হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা	... কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কাব্যোক্ত পাত্র।

পুরুষ।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি [বন্ধুসমাজে, মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি নামে পরিচিত]	একজন নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুভাষাজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি প্রায় নাই। সম্প্রতি রত্নসভা* ইঁহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।
ধনুদ্ধর [বন্ধু সমাজে-"গুণেন্দর"]	একজন ব্যবসাদার বড় মানুষ; বিদ্যেনিধির বন্ধু।
অগ্নিভট্ট [বন্ধুসমাজে-"ধূম্‌খালি"]	উকীল, বিদ্যেনিধির ছাত্র, পূর্ব্বোক্ত উভয়ের বন্ধু।

* "রত্নসভা" নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটা বৃহৎ সভা; কোন ধনশালী রাজা প্রতি বৎসর এক এক জন অধ্যাপককে মনোনীত পূর্ব্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার এই সভার প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

চাঁদকবি	একজন কিম্ভূতকিমাকার কবি। পূর্ব্বোক্ত সকলের বন্ধু।
বাপ্‌পা পাঁড়ে	বিদ্যেনিধির দ্বারবান।

স্ত্রী।

রাঙা বৌ	... বিদ্যেনিধির বর্ষীয়সী গৃহিণী; স্বভাব কিছু অধিক ঋজু।
সতিন্ বৌ	... বিদ্যেনিধির যুবতী স্ত্রী।
মোক্ষদা	... রাঙাবৌএর দাসী।
কুঞ্জ	... সতিন্ বৌএর দাসী।
সর্ব্বরী, সন্ধ্যাবালা	রাঙাবৌএর কন্যাদ্বয়।

———

নাকে খৎ।

(হাস্য-কাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি। (Seated,—a quantity of bank notes scattered before him)

বিদ্যেনিধি। (Solos স্বগত)

ঢের্ টাকা !—উঃ ঢের্ heaps of 'em ;
জয়্ জয়্কার রত্নসভার ! well, that's a name !
অনেক শর্ম্মা—বিদ্যেনিধি, বিদ্যেস্বুধি ভায়া
বেঁচে যান—(বড় নয় !) আমারি যা হওয়া !
"একাদশ বৃহস্পতি"—বচনটা ত ঠিক !
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—শাস্ত্র কি অলীক ?
নিদেন্ অনেক্ দুখ্খী প্রাণী (নামের পিঠে ছালা)
রত্নসভার্ দোহাই দিয়ে জুড়োন্ পেটের জ্বালা !

(নোট্গুলো নেড়ে চেড়ে)

তা, এই গ্যালো—এক্শো একশো—আর এক্শো এই
(এ মাস্টা চল্বে ভালো, ভাব্না বড় নেই !)
আর চার্শো—ওতে, শুধ্বো অম্বর ভায়ার দেনা ;
অঋণী মানবো শ্লাঘ্য—পরেও যদি ট্যানা।

এই পাশ্‌শো—বড় গিন্নির হাতে দেবো ফেলে ;
বাগ্‌দান্‌টা অনেক্‌ দিনের, আর চলে না ঠেলে।
(আ গ্যালো যা, তবু ফুরোয় না !)—বাকি এ পঞ্চাশ
(সব্‌ টাকা এক্‌বারে কি না !) এ পঞ্চাশ,—ও সর্ব্বনাশ
এ বছরের্‌ লাইসেনি যে আজো নিতে বাকি !
(বেওসাদারি মন্দ নয়, সেটাও হাতে রাখি,)
ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্টের কাছে,
শুভস্য শীঘ্রং যুক্তি ;—কে ওখানে আছে ?

(বাপ্পা পাঁড়ের প্রবেশ)

এক জেরা ঠহ্‌রো—
(দুইখানি চিঠির মোড়কে শিরনামা লিখিয়া)

দো খৎ লেকে যাও ;

ইয়েঃঠো কাশ্মীরি ঠাকুর্‌—লেও হাঁত্‌মে উঠাও,
ঠিকানা মালুম্‌ ? ইয়েঃ থাম্‌ উন্‌হিকো দেনা।—
দোস্‌রা ইয়েঃঠো ভট্‌জী (হ্যায় তো পহচানা ?)—
লম্বাসা মুরদ্‌, গোরা, বেল্‌কা তোঁঅর্‌ সীর—
উন্‌কা পাস্‌ লে জানা।

বাপ্পা।— হাঁ মালুম কিয়া, সার।

(বাপ্পা পাঁড়ে চিঠি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

বি। ও সব্বরি। আয়, হেথা।—

(সর্ব্বরীর প্রবেশ)

ঠাকুর মা কোথায় র্‍্যা ?

সব্ব। পূজো কচ্চে ঠাকুর ঘরে ; আমি যাই—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

(পালাবার চেষ্টা।)

বি। শোন্না লি, ফুল তুলেছে কে র‍্যা আজ তাঁর ?

তুই তুলিচিস্ ?

সব্ব। না বাবা না, আজ যে সোঁদির * ভার।

বি। যেই তুলিস্, তা অতো কেন ? আদ্ সাজিটাক্ দিবি,

পূজোয়-পূজোয় মলো মাগী !—বলি শোন্ সবি !

বলো গে তো রাঙা বৌকে আমার ঘরে যেতে।

সব্ব। কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেশ দিবি খেতে ?

আমায় দে না—

বি। দেবো এখন্, আগে গিয়ে বল্ ;

লক্ষ্মী মেয়ে সবি আমার, চল্ মা, ঘরে চল্।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পাশের ঘর)।

রাঙা বৌ এবং বিদ্যেনিধির প্রবেশ।

রাং বৌ। কেন ডাকলে ?

* সন্ধ্যাবালা।

বি। আর কিছু না, এই কখানা নোট
(তিন্‌শো টাকা) মাকে দিও,—মাস্‌খরচের মোট ;
উপ্‌রি অতিথ্‌ যত কিছু, সবই এতে সারা—
রাং বৌ। আর হতভাগীর হলো বুঝি কথাই আশার ঝারা ?
দেবো—দেবো, হচ্চে-হবে, কতই এলাকাটি !
মিছে খালি কেঁদে মলুম ভিজ্‌য়ে আচোট মাটি।
বল্লে দেবে এক্‌খানা—তা সেই বা এত কি ?
চাট্টে মেয়ে পেটে হলো—ন্যাড়া গলা ছি !
মুখ দেখাতে লজ্জা করে, লোকে কতই বলে ;
আমার বেলায় শুকনো হাঁড়ী—সবার বেলাই চলে !
এদ্দিন কিছু বলি নাই—ভালো, টানাটানি,
এখন কি যে—ঐ কি বলো—শুনচি কাণাকাণি
রত্নসভার কি নচ্ছারি—কি একটা ভারি
পদ হয়েছে—তবু কেন এখন মারামারি ?
না যদি দেও, বলুই না হয়—ভাঁড়াভাঁড়ি কেনো ?
মন ঠাণ্ডায় প্রাণ ঠাণ্ডা আসল কথা জেনো।
এদের্—ওদের্—তাদের্ বেলায় কতই শুন্তে পাই ;
ধম্ম ভেবে দেওত দিও, এখন আমি যাই।
বি। চটুই কেন ? শোনো বলি—
রাং বৌ। শুনে শুনে কালা !
বি। সত্যি বল্‌চি এবার তোমার পোহাবারোর পালা।
রাং বৌ। (থম্‌কে) তিন সত্যি কর।

বি। তিন সত্যি ?—মেয়েয়্ পড়ে !

মরদ্ কি বাৎ হ্যায় হাত্তী কি দাঁৎ—কব্‌ভি না তোড়ে,

ইয়াদ্ রাক্‌হো জী !

রাং বৌ। ও আবার্ কি ? কি দেবে দেও।

(বিপ্রে হস্ত প্রসার।)

দেখি—দেখি, কত ভরী ?

বি। ধরো, এই নেও।

রাং বৌ। (গালে হাত)

ও পোড়া ছাই ! কি অভাগগি !—এতেই ঝাঁপাই এত ?

ছেঁড়া কাগজ একটুকরো—মেতি পাতের মত !

কাজ নি—রাখো—

বি। আ আবাগী, পাঁশশো টাকার নোট !

ঐ ভাঙালিই দশনলী হয়—আর এক ছড়া গোট।

রাং বৌ। (আঁচলে বেঁধে)

জিগ্‌গুসবো—ঠাকরুণকে—

বি। দিব্বি—বিলক্ষণ !

(মুখরা প্রখরা ভার্য্যা তথাপি কাঞ্চন)

দাঁড়াও—শোনো, বলি শোনো—

রাং বৌ। শুন্‌বো, তা এখন

মিটুই আগে সন্দে'টা।

(প্রস্থান)

বি। আ তোমার মরণ্ !

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধনুদ্ধরের বৈঠকখানা।

(অগ্নি এবং ধনুদ্ধর আসীন।)

অগ্নি। হরে কিষ্ট! হরে কিষ্ট! রাধামাধব, ছি!

ধনু। (XIX Century মুড়ে)

অ্যাঁ,—কিহে, ও অগ্নিভট্ট? কও ব্যাপারটা কি?

অগ্নি। (ধনুর হাতে দিয়ে)

এই নেও পড়ো চিঠি খানি—এই নেও ধরো নোট,

রত্নসভার অধ্যেপক—কেবল ভোটের যোট!

ধনু। (নোট ও চিঠি হাতে—অবাক!)

আঃ গ্যালো যা! রওত দেখি ;

(উল্‌টে পাল্‌টে)

—না পাঁশ্‌শোই বটে!

বেশ পঞ্চাশ, বিগ্যেনিধি!

অগ্নি। ল্যাজ বেঁধে দাও জুটে।

চাঁচা ছোলা বুদ্ধিখানি গুরুর আমার বেশ ;

দিনকাণাটা মাঝে মাঝে—ঐটে দোষের শেষ!

অনেক জানে, অনেক পড়ে, অনেক ভাষায় জ্ঞান,

বিষয় কাজে এই খান্‌টা (কপালে হাত দিয়ে)—

আঁদারে ল্যাণ্ঠ্যান্!

তাঁর আবার গে বেওসাদারি—লাইসেনির পাস !

মরুন্ গিয়ে ভট্টি পড়ে—নয় করুন্ গে চাষ !

ধনু। চটো কেন ?

অগ্নি। দেখো দেখি—চট্‌বো না ত কি ?

পঞ্চাশে—পাঁশশোর ফের—তার্ টিকি কেটে দি।

ধনু। থাক্‌লে ত ?

অগ্নি। কি বল্‌বো ছাই—চাঁদ কবি যে নাই !

ধনু। না, বেচারা—ভাব্বে কত !—ফেরোৎ দেওয়া চাই।

অগ্নি। তুমি দেখ্‌ছি আর্ একটী ! রগড় করে কে ?

সাধে খুঁজি চাঁদ দাদাকে,—থাকতো যদি সে—

ধনু। তাই বলো না—রগড় খোঁজো ?

অগ্নি। বল্‌বে ঘোড়ার ডিম্ !

টাকা ফেরৎ দেবে তাকে ? থাক্ আগে হিমসীম !

ধনু। তবে চলো বড্ডীর হাতে দিয়ে আসি তাঁর,

বাড়তি যেটা সাড়ে চাশ্‌শো—বেশ হবে পয়জার !

ঘরে ঘরে বাধ্‌বে ভালো—জল্‌টা উচুনীচু !

ভাল মানুষের মেয়ে না হয় পেয়ে যাবে কিছু।

অগ্নি। বেশ কথা এ,—চলো তবে—খাবার খেয়ে আসি,

শীগ্‌গির বলো গাড়ী জুত্তে। (প্রস্থান)

ধনু। কোন্ হায় রে ? ঘাঁসী,

কোচ্‌মানকে ভেজো ইহাঁ।—না, দিব্বি পীরের খাসী !

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিদ্যেনিধির বাটী।)

ধনুদ্ধর ও অগ্নিভট্টের প্রবেশ।

ধনু। বিদ্যেনিধি মহাশয়, বাড়ী আছেন গো ?

অগ্নি। কারুই যে সাড়া নাই—

ধনু। ও বিদ্যেনিধি,—ও—ও—;

না, ঘরে নাই।—ও সব্বরি,—ও নিশি—ও সন্দেবালা,

নিঝ্‌ঝুম যে, সাড়া শব্দ বন্ধ—একি জ্বালা !

ও গো, কে আছ গো ?

অগ্নি। গ্যালো যা বাড়ী শুদ্ধ কালা ?

রাং বৌ। (পরদার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে)

ও মোক্ষদা, জিগ্‌গোস্‌ না, কে ?

মো। হ্যাঁ গা, কে তোমরা গা ?

কাকে খোঁজো ?—কত্তা বাড়ী নেই।

ধনু। কত্তার মা ?

তিনি কোথা ?—আর মেয়ে সব্‌ যত কুঁচো কাঁচা ?

মো। ও গো, সবাই গ্যাছে—সে বাড়ীতে।

ধনু। বাইরে এসো বাছা।

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

হ্যাঁ গা, একাই তুমি আছ ?—বৌ ও নেই ঘরে ?

মো। কোন্ বৌ গো, রাঙা বৌ ?--বাড়ী মাথায় করে
তিনিই কেবল আছেন একা।

ধনু। (অগ্নিকে) কর্ত্তব্য কি পরে ?

অগ্নি। গুরু-পত্নী—হান্ কি তাতে ?—ওগো বাছা শোনো।

ধনু। করিস্ কি,—ও মিন্‌সে ?

অগ্নি। তুমি গাছের পাতা গোণো.
একাই আমি যাবো না হয়। ও ঝি, তাঁকে বলো,
বাবু একটি মোটা সোটা—গণেশ-পেটা, ধলো,
ধীরপুরে ঘর, বড় দরকার—দেখা কত্তে চান।
আর—পড়ো আমি গুরুঠাকুরের—আমাত্তরে পান
এনো ছুটো হাতে করে্য।

মো। (অগ্নির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিয়া)
আপনারা দাঁড়ান !
(প্রস্থান)

মো। (পরদার পশ্চাৎ ভাগে)
ও রাঙাবৌ, খড়কি তুলে দেখদেখি চেয়ে
বাবু ছুটি, কে ওনারা ? চিন্তে পার মেয়ে ?
একটি ওঁদের গেরস্থারি, একটি কিছু কাঁচা
(জানিনে মা আজ্‌কাল্‌কার কল্‌কাতার কি ঢাঁচা)
পান খেতে চায় ! আবার বলে আস্‌বে তোমার ঠাঁই ;
চেনা শুনো হবে বুঝি ! দরোয়ানটাও নাই ?

রাঙা বৌ। ও ঝি, ওঁদের আস্‌তে বল্, বস্‌তে জায়গা দে।

মো। (দুইখানি আসন পাতয়া)
আস্থন তবে।

রাঙা বৌ। ও মখি, ও পোড়ারমুখী কপাট টেনে দে।

(কপাট অদ্ধবদ্ধ করণ)

ধনুঃ ও অগ্নি অন্দরে প্রবেশ।

ধনু। দরকারী কাজ তাই আজকে এতো বাড়াবাড়ি,
কৰ্ত্তাটি কি গাঁজা টানেন! টাকার ছড়াছড়ি?
পঞ্চাশেতে পাশ্‌শো দেন্—হিসেব আঁটাআঁটি!
রাখো তুলে, ধরো এখন সাড়ে চাশশো খাটি।
পাশ আপিসে পঞ্চাশ দিতে পাশ্‌শো দেছে ফেলে,
মাথা খুঁড়্‌লেও দিওনা তাঁয়, দেখ্‌বো কেমন ছেলে!
ও টাকাতে গয়না করো—না হয় যদি পারো
কোম্পানীর কাগোজ কিনে আথের স্থসোর করো
দাঁতে কুটা নিলেও তবু দিও না এ তায়,
কোথা পেলে এখন্ যেন সন্ধান না পায়।

মো। (রাঙা বৌএর হইয়া) উনি বল্‌চেন—
আপনিই রাখুন, কাজ কি হাতের ফেরে;
গয়নান্তরে পাঁশ্‌শো টাকার নোট দিয়েছেন ধরো
আজ সকালে; তাই ভাব্‌চেন আবার কেমন করো
নেবেন এটা?

ধনু। (মোক্ষদার প্রতি) কই, দেখি? নেও ত চেয়ে।
(অগ্নিকে) ওহে শৰ্ম্মা—বুঝেছ ত?

অগ্নি। তোমার আগে—all bright as day.

(ভিতরে বাক্স টানার ও চাবি খোলার শব্দ)

মো। (ধনুর প্রতি)

এই নিন, এই কাগজখানি আজ সকালে দিয়া

নিরুদ্দেশ সেই অবধি। (নোট প্রদান)

ধনু। (নোটখানি দেখিয়া)

ও শর্ম্মা ভায়া,

দেখো দেখো, যা ভেবেচি, ঠিকঠাক এ তাই।

(নোট দেখাইয়া)

অগ্নি। হদ্দ কল্লে বিদ্যেনিধি "ড্যাম his আই!"

ধনু। (৫০০ টাকার নোট দিয়া)

এখন তুলুন সবগুলি এ সিন্দুকটী খুলে ;

আ-হাবা, বামুনের মেয়ে, এতেই গেচেন ভুলে ?

পাঁশ্‌শো নয়ত! পঞ্চাশ যে তোমার যা তা হেথা,

এখন কি আর এ সব নিতে ধম্মাধম্মির কথা ?

পাঁশ্‌শো দেছে পাঁশ্‌শোই ওঁর। কসে বাঁধুন গিরে

পরশু দিনে বিকেল বেলা আসব আবার ফিরে।

আমরা এলে পরে যেনো—দেছেলো যে খানি,

সেইখানিকে দেখিয়ে তাঁকে, করেন টানাটানি।

ঘোরফের সব মিটে যাবে মিলবো যখন সবে ;

ভালমান্‌ষের মেয়ে তোমার পূরো পাঁশ্‌শোই হবে

(আসন হইতে উত্থান।)

রাঙা বৌ। ও মোক্ষদা, বস্‌তে বল্‌, খাবার তৈয়ের্‌ করি।

ধনু। আজ্‌ থাক্‌, সে পরশুই হবে, আগে চুরি ধরি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যেনিধির অন্তঃপুর বাটী।

সতিন বৌ ও কুঞ্জর প্রবেশ।

স। কি লো কুঞ্জ—দেখা হোলো?

কু। না, সত্যই মা, না।

স। ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা?

কু। তোমার মাথা!—ভেঙ্গে বল্‌!

তোর আজকে নতুন কেতা!

কু। সবই নতুন—একলাই কোন থাক্‌বে ছেঁড়া ন্যাতা?

স। তুই যে দাসুরায়কে টেক্কা দিলি? ও কুঞ্জ ঝি।

কু। সত্যই মা, শুন্‌লুম গিয়ে ও বাড়ীতে

স। (সাগ্রহে) কি শুন্‌লি, কি?

কু। শুনে এলুম কাণাঘুষো পাঁশ্‌শো টাকার নোট,

তিনশো ভরির চন্দ্রহার একশো ভরির গোট;

রাঙা বৌয়ের ভাঙ্গা কপাল শুন্নু গ্যাছে ফিরে!

ভখন ভাগ্যবতীর পেস্তাবাদাম—সতীনমায়ের জিরে !

স। রাখ্ তোর ছড়াকাটা—কে বল্লে তোকে ?

কু! ওরাই বলে—তারাই বলে—পাড়াশুদ্দ লোকে।

স। কুঞ্জ, আমার মাথা খাস্‌লো, আন্‌গে তাকে ডেকে।

কু। (জিব কেটে)

ছি কি কথা ? আন্‌বো তো গা নাগাল পেলে তায় ?

চৌপাহারা চাদ্দিকে যার তায় কি ধরা যায় ?

কাট্‌লে শেকল আর কি পাখী দাঁড়ের পানে চায় ?

এখন্ রাঙা বোয়ের খাঁচায় পোরা, আর্ কে তাকে পায় !

স। পোষা যে লা ? অনেকদিনে অনেক্ ছাতু গুলে

সিটী দিতে শিখিয়েছি তায় সেও কি যাবে ভুলে ?

যা কুঞ্জ যা, যেথানে পাস্, আ—ঐ যে গুণমণি।

(দূরে বিদ্যেনিধিকে দেখিয়া)

যা, সরে যা—ঐ ঘরে থাক্ ; আজকে খুনোখুনি !

(বিদ্যেনিধির প্রবেশ)

স। (তাহার নিকটে গিয়া)

আমার কিছু চাই।

বি। হাতে কিছু নাই।

স। ওদের, ওদের বেলা

তবে টাকার কেন খেলা ?

রাঙা ডোবার জলে

শুনি, ছি নী নি চলে।

ঢাকাই জালা পেট,
চন্দ্রহারে সেট!
কাঁকাল গাদা বোট
তাইতে সোণার গোট!
আমার বেলা যেই,
অমনি হলো নেই!।

বি। কে বলেছে এ সব কথা?

স। কেন?—একি সব উচ্ছে নত্তা?

বি। দি, দিয়েছি ইচ্ছে আমার।

স। কে তোলাবে—আমার—?

বি। যা ছিল তা সব গিয়েছে।

স। কতো ছিল?– কে নিয়েছে?

বি। তোমায় বলে তা—হবে কি?

স। শুভঙ্করী আঁক্ শিখ্ছি।

বি। ক্ষ্যামা কর—ক্ষ্যামা কর—সত্যি হাতে নাই।

সবৌ। একাদশ বৃহস্পতি—কি তবে সে ছাই!
শনিবারে জেবে পূরে এলো এতো গুলো—
মার্কামারা—"ভেলম-পেপার"—সে গুলো কি ধূলো?
ভাল বটে নাগরালি কারো মুখে খাজা!
তারি যেনো আট্টা মেয়ে—আমি কি তা বাঁজা?

বি। ক্ষেমঙ্করী ক্ষ্যামা কর—হিসেব শোণো বলি;
ধূলিগুঁড়ি সবই গ্যাছে—শূন্য এখন থলি।

দিব্বি করি পায়ে ছুঁয়ে (জানুপাতপূর্ব্বক)

—চাশ্‌শো মহাজনে,

তিন্‌শো গেল পেটে খেতে—পঞ্চাশ লাইসেনে ;

আর পাঁশ্‌শো—আর পাঁশ্‌শো রাখ্‌তে দিয়াছি,

ভাল মন্দ আখের ভেবে—

স। আমিই তবে কি

ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো ও বিদ্যেনিধি ?

বি। ফিরে বারে যত পাবো, তোমায় দেবো সব,

শুক্ল হাঁড়ি—পায়ে নেড়ে—কেন কর রব ?

স। লেখো তবে—লেখো খত—(আন্‌তো ঝি ইংষ্ট্যাণ্ড)

সুদশুদ্ধ লিখে দেও—"প্রমিসরি বণ্ড"

আমি নাকি বোকা মেয়ে—আমায় দেবেন ফাকি ?

গুণনিধি, গুণীন্ আমি, চিনি ভালো—চাকি।

বি। (খত লিখিয়া পাঠ করণ)

"I O U—আই প্রমিস্"—সাতশো টাকা সাড়ে,

"অন্ ডিমাণ্ডে" দেবো আমি সুদে যত বাড়ে ;

মাসে মাসে—টাকায় টাকা সুদ দিতে স্বীকার ;

না যদি দি—সতীন বৌএর শ্রীপদ-প্রহার।

স। এখন—সে বাড়ী যাও বিদ্যেনিধি !—করো গে আহার

সঃ বৌ। (প্রস্থান)

(ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যেনিধির প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যোনিধির গৃহ।

আসীন তক্তপোষে—

বিদ্যোনাধ, ধনুদ্ধর ও অগ্নিভট্ট।

ধনু। আজ্ঞে বড় ব্যাজার ব্যাজার?

বি। এমন কিছু নয়।

ধনু। তবু—তবু?

বি। মাথা মুণ্ডু—

ধনু। বল্‌তে লজ্জা হয়?

বি। আর জ্বালিও না,—ঢের জ্বলেছি!

অগ্নি। সে কেমন আবার?

কি জ্বালাতন গুরুঠাকুর?

(সন্ধ্যাবালার প্রবেশ।)

সন্ধ্যা। ও বাবা, একবার

বাড়ীর ভেতর মা ডাক্‌চে।

বি। যা যা—এখন যা।

সন্ধ্যা। আয় শীগ্‌গির শীগ্‌গির করে—ডাক্‌চে তোকে মা।

বি। সেও মরুক—তুইও মর্, দে—কাপড় ছেড়ে দে।

যাবো এখন—যখন খুসী।

ধনু। ভারী গরম যে?

যাও না কেনো, একটিবার শুনেই না হয় এলে;

আমরাও ত বস্‌বো, খাবো -দোষটা কি তা গেলে?

বি। বড় জ্বালালে চল্‌ যাচ্চি। (সন্ধ্যার সহিত প্রস্থান।

অগ্নি। আমরাও গুড়ি গুড়ি

' ' চলো না কেন পেছু ধরি।

ধনু। আ বিশ্বের ঝুড়ি!

টের পাবে যে—সব ফাঁস্‌বে—তুমি কি পাগল?

হেথা বসেই সব শুন্‌বে;—ভাবনাটা কেবল

পার্‌বে কি না তাল রাখ্‌তে;—নয় কুঁড়ুলে খল।

অগ্নি। ঐ বেধেছে—নারোদ নারোদ!—পারবে না কোঁদল?

কোঁদল ছাড়া মেয়ে মানুষ কে দেখেছে কবে?

ধনু। শোণো—শোণো—হচ্চে কি।

রাং বৌ। হ্যাঁগা নাকি তবে

পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট গয়নান্তরে দেছ?

জুয়োচুরি এমনতরো কদ্দিন শিখেছ?

তাই বুঝি,তা—ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌তে দিতে মানা?

ভেল্কি খেলার চোখে ধুলো—যায় পাছে বা জানা!

নেই বা দিতে;—এ ভাঁড়ামি এ বয়সে—ধিক!

গলায় দড়ি! বিদ্যেনিধি উপেধটাতেও ধিক্!

আর একটা—কি ঐ যে—রত্ন কিসের পান্না—

তাতেও ধিক্—ধীক্—ধীক্—বড়ই বেহায়া!

মাথা খুঁড়ে মর্‌বো আমি—ঘর সংসারে ছাই,

এই নাও সেই জ্বালী কাগোজ—

(৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া)

বি। কি জ্বালা—বালাই।

এই খানা কি সেই খানা ?

রাং বৌ। না, অনেক স্যাঙাৎ ভাই

আছে কি না—দিচ্চে আমার হাতে গুণে গুণে ?

বলতেও লাজ নাই কি মুখে ?—পোড়াও গে উনুনে।

বি। তাইতো—তবে কেমন্ হোলো ! কাকে দিনু ভুলে ?

রাংবৌ। হয় তো তাকেই দেছ—যার পাধ্‌ধূলো খাও গুলে !

বি। (ক্রুদ্ধ হইয়া)

মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্—বড্ড বাড়াবাড়ী ?

শিকেয় তুল্লে এমনিই হয় ভাঙা ছড়ার হাঁড়ী !

ধনু। (বাহির হইতে)

বিদ্যেনিধি, বলি ওকি ?—কি হয়েছে অ্যাঁ ?

ভদ্রলোকের কথার কেতা এমনিই বটে, ছ্যা !

বি। (হতবুদ্ধিভাবে নোটখানি দেখিতে দেখিতে প্রবেশ)

তাইত !—তবে এ কি হলো ?

ধনু। কি হয়েছে বলো।

বি। (হবে আর কি মাথা মুণ্ডু !—এদিক ওদিক গ্যালো।)

শম্ভাভায়া, হ্যাঁ হে, তোমার চিঠির ভেতর মোড়া

নোটখানা সে কত টাকার ?